বাঙ্গালার বীর

(প্রথম খণ্ড)

—:০:—

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ, এম্-এ।

এজেন্ট :—কমলা বুক্ ডিপো লিমিটেড,
কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ
ভারত বুক এজেন্সি
৩৮, নন্দকুমার চৌধুরী লেন,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র,
শ্রীপতি প্রেস,
৩৮, নন্দকুমার চৌধুরী লেন,
কলিকাতা।

ভূমিকা

অন্যান্য বহু গুণের মধ্যে **বীরত্ব** যে মানব চরিত্রের একটি বিশিষ্ট গুণ, একথা না বলিলেও চলে। কি জাতীয়, কি ব্যক্তিগত, বিশেষ কোন পুরুষোচিত শক্তির উচ্চতম প্রকাশই এই বীরত্ব। যে জাতি বীরধর্ম্মে হীন, জীবন-সংগ্রামে সে জাতি কখনও আপন মর্য্যাদা রাখিতে পারে না—মানব-জাতিরও কোন স্থায়ী কল্যাণ সাধন করিতে পারে না।

প্রত্যেক জাতিরই একনিষ্ঠ লক্ষ্য এই থাকা উচিৎ যাহাতে উপযুক্ত ভাবের উন্মেষে ও কর্ম্মের অভ্যাসে বীরোচিত চরিত্র বাল্য-জীবনেই গড়িয়া উঠে। স্বজাতির বীরগণের চরিতকথা এই লক্ষ্য-সাধনের উপযোগী যে প্রেরণা আনিতে পারে, এমন আর কিছুই পারে না।

ইতিহাসে ও সাহিত্যে বাঙ্গালী বীরগণের চরিতকথা তেমন স্পষ্ট-ভাবে কোথাও বড় লেখা হয় নাই। প্রধানতঃ এই কারণেই একটা ভুল ধারণা সকলের মধ্যে আছে এই যে অন্যান্য যত গুণই থাক্, বীরত্বে বাঙ্গালী বড় হীন। কতকটা এইরূপ একটা ধারণার ফলে, কতকটা বীর-জীবনের দৃষ্টান্তের অভাবে, বীরোচিত চরিত্র-গঠনের মত প্রেরণা বাঙ্গালী বালকেরা একেবারেই পায় না বলিলেই হয়। যাহাতে এই অভাব কিছু পরিমাণে দূর হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালী বীরগণের এই চরিতকথা সঙ্কলনে প্রয়াসী হইয়াছি। **বাঙ্গালার বীর**—প্রথম খণ্ড বাহির হইল। প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি আরও দুই খণ্ডে যতশীঘ্র সম্ভব বাহির হইবে।

বালকগণের পক্ষে চিত্তগ্রাহী করিয়া তুলিবার জন্য সহজ ও গল্পের ভঙ্গীতে চরিতগুলি লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। গল্পের ভঙ্গীতে লেখা হইলেও ইতিহাসের ধারা যাহাতে অব্যাহত থাকে সে দিকেও দৃষ্টি রাখিতে যত্নের ত্রুটী করি নাই। কোনও না কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

নাই, এমন কোন কাল্পনিক কাহিনীকে গল্পগুলির মধ্যে স্থান দিই নাই। তবে পণ্ডিতেরা যাহাকে প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাস বলেন কেবল তাহারই সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকি নাই। কিম্বদন্তী ও প্রাচীন কাব্য সাহিত্যের বর্ণিত ঘটনার বিবরণ হইতেও অনেক কথাই গ্রহণ করিয়াছি। এই সকলেরও ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। পণ্ডিতেরা যে ঘটনাকে ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ বলেন তাহাও-ত অনুমান মাত্র। তথা-কথিত প্রমাণের ভারে ভারাক্রান্ত এই অনুমানগুলি হইতে যাঁহারা ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসন্ধান করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে সে অনুসন্ধান যতই প্রয়োজনীয় হউক, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা কোনরূপ শিক্ষার সহায়ক হয় না। প্রাচীন ভারতকে বুঝিবার পক্ষে এইরূপ রাশি রাশি ইতিহাস অপেক্ষা রামায়ণ মহাভারত আর পুরাণ সাহিত্য অনেক বেশী উপযোগী গ্রন্থ। অথচ পণ্ডিতগণ এগুলির কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। অসংখ্য কাহিনীর মধ্য দিয়া যে সাহিত্যে একটা জাতির সমগ্র জীবন পরিস্ফুট হইয়াছে, জাতির প্রকৃত ইতিহাস সেই সাহিত্যের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া কিম্বদন্তী ও কাব্য সাহিত্যে নিবদ্ধ কাহিনীর উপরে বহুপরিমাণে নির্ভর করিয়া এই চরিতকথাগুলি আমি সঙ্কলন করিয়াছি। বাঙ্গালার প্রকৃত মূর্ত্তি সেই সমস্তের মধ্যে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, কেবল তথাকথিত প্রমাণসিদ্ধ ঘটনাসম্বলিত কোন ইতিহাসে সেরূপ পায় নাই।

যাহাদের জন্য লেখা, বাঙ্গালার সেই প্রিয় বালকবালিকাগণ আনন্দে এই চরিতকথাগুলি পড়িয়া মাতৃভূমি বাঙ্গালার প্রকৃত স্বরূপটিকে যদি চিনিতে পারে, আর তাহার প্রেরণা যদি চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে, তবেই প্রাচীন বয়সে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস চরম সার্থকতার গৌরবে মণ্ডিত হইবে।

কলিকাতা,
২রা শ্রাবণ, ১৩৩৭। গ্রন্থকার।

সূচী-পত্র

চিত্র-সূচী

বাঙ্গালার বীর

বাঙ্গালা

বাঙ্গালার গ্রাম—গ্রামের শ্রী ও সম্পদ।

আমরা বাঙ্গালী আর আমাদের এই দেশ বাঙ্গালা। বাঙ্গালা! এই নামের মত এমন মধুর, এমন আপন, এমন সরস আর কিছু কি আছে? কথাটি মুখে যখন বলি, আর কানে যখন শুনি, প্রাণটা আমাদের কি আনন্দেই না নাচিয়া উঠে! যখন বিদেশে যাই অথবা নগরে বাস করি, তখন এই কথাটি শুনিলে মনে পড়ে, আমাদের বাড়ীঘর আর আমাদের গ্রাম; মনে পড়ে বাড়ীর সব আপনজন, পাড়াপড়সী ও গ্রামবাসী লোক, যাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কত মধুর, কত হৃদ্য!

সেই যে আমাদের গ্রাম, এই রকম গ্রামের পর গ্রাম,—অসংখ্য গ্রাম লইয়া আমাদের এই বাঙ্গালা দেশ। মধ্যে মধ্যে বড় বড় মাঠ, মাঠ-ভরা ধান কলাই তিল সরিষা আর পাটের ক্ষেত। কোথাও কেবলই সবুজ ঘাস, পালে পালে কত গোরু ছাগল চরিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও বা বহু দুর ব্যাপিয়া এক একটি বিল। এই বিল বর্ষার জলে ডুবিয়া যেন এক একটি ছোট ছোট সাগর হইয়া দাঁড়ায়। বর্ষার শেষে শরৎকালে এই সব বিল ভরিয়া শ্বেত, রক্ত, নীল,—কত রঙের—পদ্ম ফোটে—দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়! এই সব গ্রাম, মাঠ আর বনের মধ্যে কত যে নদী,

খাল নালা আছে, গণিয়া শেষ করা যায় না। ছোট বড় কত রকম নৌকায় অবিরত হাজার হাজার লোক কত কাজে এই সব নদী খাল নালা দিয়া যাতায়াত করিতেছে। আর এই সব নৌকায় চড়িয়া যাইতে যাইতে দেখা যায়, দুধারে কত গ্রাম, কত হাট, বাজার, বন্দর, কত নারিকেল-সুপারী-তাল-খেজুর-আম-কাঁটালের বাগান, কত শস্যের ক্ষেত, কত গোচারণের মাঠ, কত নলখাগড়া, হোগলা, কুশকাশের জঙ্গল, কত বাঁশের ঝাড়, ফণাসিজু, রাঙচিতা ও বেতের ঝোপ! বাঙ্গালার সকল শোভাসম্পদ্ যেন থরে থরে সারিতে সারিতে সাজান রহিয়াছে!

এই দেশের মাটি অসংখ্য নদী-নালা খালবিলের জলে ঠাণ্ডা ও নরম। পেট ভরিয়া খাইতে আর ঘর বাঁধিয়া থাকিতে যাহা কিছু লাগে, সব তাহার এই সোনা-ফলা দেশের মাটিই আমাদিগকে অবিরত যোগাইতেছে।

কাপড় হয় কাপাসের তূলায়, কাপাসও বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে আগে অনেক জন্মিত। শুনিয়াছি, ৭০।৮০ বৎসর আগেও, এই কাপাসের তূলা হইতে ঘরে ঘরে মেয়েরা চরকায় সূতা কাটিতেন, তাঁতী জোলারা সেই সূতায় কাপড় বুনিয়া দিত। দুই সের তূলা দিলে এক সের ওজনের কাপড় পাওয়া যাইত। এখন কিন্তু ঘরে ঘরে সূতা কাটাও নাই, মাঠে মাঠে কাপাসগাছও দেখা যায় না। কাপাসের তূলায় কাপড়ের সূতা আর লেপ-তোষক হয়। শিমুলের তূলায় বালিশ আর গদী হয়। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে অনেক শিমূল গাছ দেখা যায়। শীতের শেষে শিমূল গাছ ভরিয়া বড় বড় লাল লাল ফুল ফোটে। এই ফুল হইতে এক রকম ফল হয়। ফলগুলি পাকিয়া যখন ফাটিয়া যায়, তখন তাদের মধ্য হইতে গুটি-গুটি তূলা হাওয়ায় উড়িয়া আসিয়া মাটিতে পড়ে—লোকে

কুড়াইয়া লয়। তোমরা নিশ্চয়ই অনেকেই শিমূলের ফুল আর তুলা দেখিয়াছ।

ফল ফুলে ভরা, গাছ পালায় ঘেরা, ছায়াশীতল সব গ্রাম, শস্য-ঘাসে সবুজ সব মাঠ, পদ্মফুলের হাসিভরা নির্ম্মল কালো জলের বড় বড় সব বিল, আর নৌকা, ডোঙা ও ডিঙিতে ভরা অসংখ্য নদী-খাল-নালা! উপরে নির্ম্মল নীল আকাশ, দিনে ঝক্‌ঝকে রোদ আর রাত্রিতে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। তার মধ্যে আবার এই সব সবুজ গাছ পালা নাচাইয়া, শস্যক্ষেত্রের সবুজ সাগরে ঢেউ খেলাইয়া, নদী-খাল-নালায় মৃদু লহর তুলিয়া, গা-জুড়ান কি যে মিষ্ট হাওয়া বহিয়া যায়! হাওয়ার যেন প্রাণ আছে! এই শোভার আনন্দে সব নাচাইয়া নিজেও যেন নাচিয়া বেড়ায়; নাচিয়া নাচিয়া লুটিয়া পড়ে, আর শন্ শন্ শব্দে সুর তুলিয়া তার প্রাণভরা আনন্দের কথা সকলকে জানায়। গাছে গাছে পাখী ডাকিয়া উঠে; হাওয়ার গানের সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়া গাহিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়ায়।

এই আনন্দের সাড়া পাইয়া মুগ্ধ হইয়া আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র— বাঙ্গালাকে বন্দনা করিয়া গাহিয়াছেন,—

"বন্দে মাতরম্!
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্!
শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীং
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিণীং
মাতরম্!"

গ্রামের দেশ

নদী খাল বিল মাঠে ঘেরা এই রকম সবুজ গ্রাম,—গ্রামের পর গ্রাম—সারা বাঙ্গালা দেশটাই গ্রামের দেশ। সহরে পাকা রাস্তার দুই ধারে গায়ে গায়ে সাজান কেবলই সব পাকা বাড়ী! এ রকম সহর বাঙ্গালা দেশে বড় কম। কোনও না কোনও গ্রামে পৈতৃক বাড়ী নাই, কি পিতৃপুরুষদের বাড়ী ছিল না, এমন প্রবাসী বা নগরবাসী বাঙ্গালীও বড় দেখা যায় না।

উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, আর দক্ষিণে বঙ্গসাগর, পশ্চিমে বিহার আর ছোটনাগপুর, পূর্ব্বে আসাম, ইহার মধ্যে সমতল একটি বিরাট বিশাল প্রান্তরের উপরে বাঙ্গালার গ্রামগুলি সাজান রহিয়াছে। মাঠগুলি নানাবিধ শস্যে শোভা পাইতেছে, বিলগুলি পদ্মবনে হাসিতেছে, আর নদনদীগুলি লহর তুলিয়া বহিয়া যাইতেছে। একখানি বিমানে চড়িয়া বাঙ্গালার উপরে আকাশে উঠিয়া যদি তোমরা নীচের দিকে তাকাও, মনে হইবে বিচিত্র একখানি শ্যামবর্ণের আস্তরণ হিমালয় হইতে বঙ্গসাগর পর্য্যন্ত বিছান রহিয়াছে, আর তার উপরে আঁকাবাঁকা নদীখালগুলি যেন সব মুক্তার ছড়া সাজান।

নদীমাতৃক দেশ

এই যে সব নদী দেশের মধ্য দিয়া বহিতেছে, বর্ষাকালে বন্যায় সেগুলির জল বাড়িলে অনেক গ্রাম আর মাঠ একেবারে ভাসাইয়া দেয়। দুই তীরে অনেক পলিমাটি রাখিয়া বর্ষার শেষে সেই জল আবার নামিয়া যায়। এই মাটির গুণেই এই সব মাঠ আর গ্রামগুলির জমি চিরকাল উর্ব্বরা থাকে, আর তাহাতে প্রচুর ফলশস্য জন্মে। আবার সাগরের কাছে বহুকাল হইতে চড়া পড়িয়া পড়িয়া বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ সাগরের মধ্যেও বাড়িয়া যাইতেছে। বাঙ্গালার দক্ষিণে মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা,

খুলনা, বরিশাল আর নোয়াখালি। অনেকে বলেন, এই জেলাগুলি আগে সাগরের মধ্যেই ছিল, চড়া পড়িতে পড়িতে গড়িয়া উঠিয়াছে। নদীগুলি জলে ভরা, নদীর জলের পলিমাটিতে মৃত্তিকা নিত্য উর্ব্বরা, দেশের অনেক অংশ নদীর চড়ায় চড়ায় নূতন করিয়া গড়া, তাই বাঙ্গালাকে অনেকে 'নদীমাতৃক' দেশ বলিয়া থাকেন।

বাঙ্গালার নাম—গৌড় ও বঙ্গ

একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে, বলি নামে এক চন্দ্রবংশীয় রাজার পাঁচটি পুত্র হয়! তাঁহাদের নাম ছিল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র আর সুহ্ম। এই পাঁচজন রাজপুত্র পাঁচটি রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহাদেরই নামে পাঁচটি রাজ্যেরও নাম হয়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র আর সুহ্ম।

এই বঙ্গ এখনকার পূর্ব্ব বাঙ্গালা; আর পুণ্ড্র উত্তর বাঙ্গালার মালদহ অঞ্চল; কলিঙ্গরাজ্য এখনকার উড়িষ্যা; সুহ্ম, কামরূপ বা আসাম আর অঙ্গ এখনকার ভাগলপুর অঞ্চল।

আর একটি গল্প আছে, সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার এক দৌহিত্র ছিলেন, তাঁর নাম ছিল গৌড়। বাঙ্গালার পশ্চিম ভাগে এককালে ইঁহার যে রাজ্য ছিল, তার নামও হয় গৌড়। প্রাচীন কালে আমাদের বাঙ্গালা দেশ গৌড় নামেই ভারতে পরিচিত ছিল; ইহার পূর্ব্বভাগকেই কেবল বঙ্গ বলিত। পশ্চিম বাঙ্গালার লোকেরা পূর্ব্ববাঙ্গালার লোককে 'বাঙ্গাল' বলে, তোমরা জান। বঙ্গ হইতেই এই বাঙ্গাল নামটির জন্ম।

মহারাজ বল্লাল সেনের সময় হইতে বাঙ্গালার তিনটি প্রধান ভাগের নাম পাওয়া যায়, রাঢ়, বরেন্দ্র আর বঙ্গ। রাঢ়—গঙ্গার পশ্চিমে পশ্চিমবাঙ্গালা, বরেন্দ্র—উত্তর বাঙ্গালা আর বঙ্গ—গঙ্গার পূর্ব্বে মধ্য ও পূর্ব্ববাঙ্গালা। নামগুলি এখনও আছে, এবং বাঙ্গালী হিন্দুর সমাজ এই তিন অঞ্চলের

নামে এখনও তিন ভাগে বিভক্ত—যেমন রাঢ়ী সমাজ, বারেন্দ্র সমাজ আর বঙ্গজ সমাজ।

মুসলমানেরা যখন রাজা হন, তখনও বাঙ্গালা দেশের নাম ছিল গৌড়। কেবল পূর্ব্ববাঙ্গালাকে বঙ্গ বলা হইত। দিল্লীর পাঠান সুলতানেরা ছিলেন ভারতের সম্রাট্ এবং তাঁহাদের একজন শাসনকর্ত্তা এই অঞ্চল শাসন করিতেন। এই সময়ে বঙ্গ বা পূর্ব্ববাঙ্গালা ধনে জনে আর শক্তিতে খুব বড় হইয়া ওঠে। বঙ্গকে লোকে বাঙ্গালাও বলিত। দিল্লীর সম্রাট্‌রা দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় সামসুদ্দিন ইলিয়াসসাহ নামে একজন শাসনকর্ত্তা এই বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা হ'ন। ক্রমে সমস্ত গৌড়দেশ তিনি জয় করেন এবং সমগ্র গৌড়েরও নাম হয় বাঙ্গালা।

সেই অবধি এদেশের বঙ্গ ও বাঙ্গালা এই দুটি নামই চলিয়া আসিতেছে, এবং গৌড় নামটি একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। দেশের দুইটি বড় ভাগ যেমন ছিল গৌড় আর বঙ্গ, দুই ভাগের লোককেও সকলে গৌড় আর বঙ্গ বলিত। কিন্তু এখন দুই ভাগ মিলাইয়া হইয়াছে বাঙ্গালা, এবং দুই ভাগের লোকই এখন বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত।

প্রাচীন রাজধানী

গৌড়ের রাজধানীর নামও ছিল গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী। এই নগরটি ছিল এখনকার মালদহ জেলায়। সেন রাজাদের সময় গৌড়, নবদ্বীপ আর রামপাল এই তিনটি নগরই গৌড়ের বা বাঙ্গালার রাজধানী হইয়াছিল। রাজারা এক এক সময়ে এক এক নগরে থাকিতেন। এই নবদ্বীপ এখন নদীয়া জেলায়। বহুকাল যাবৎ বড় বড় অনেক পণ্ডিত এখানে বাস করিতেছেন এবং নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব এই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই অবধি ইহা বৈষ্ণবদের

সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান হইয়াছে। নবদ্বীপকে এক রকম বাঙ্গালার কাশী বলা যায়। রামপাল ছিল এখনকার ঢাকা জেলায়। এখনও এখানে সেন রাজাদের অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন দেখা যায়।

ব্যবসায়বাণিজ্য কি অন্য কাজকর্ম্মের জন্য যাঁহারা সহরে গিয়া বাস করেন, তাঁহারাও পরিচয় দিবার সময় বলেন, আমরা অমুক গ্রামের অমুক সমাজের লোক! আজকাল গ্রাম আর গ্রামের বাড়ীঘর ছাড়িয়া অনেকে সহরে গিয়া বাস করিতেছেন। ইঁহাদের ছেলেপুলেরাও সহরেই জন্মিয়াছে, সহরেই বড় হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালার গ্রাম অঞ্চলের যে শ্রী, আর গ্রাম্য জীবনের যে আনন্দ, তাহার কিছুই ইহারা সন্ধান রাখে না তাহারা নিজেদের দেশ কি তাহা চেনে না, দেশের জীবনটা কিরূপ, তার কোনও খবর রাখে না, তার আনন্দের সাড়াও কিছু পায় না। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর নামে তেমন একটা আনন্দ ও গৌরব তাহারা অনুভব করিতে পারে না। এমন অবস্থায় যাহারা বড় হইয়া ওঠে, বাঙ্গালার খাঁটী বাঙ্গালী সন্তান তাহারা হইতে পারে না।

সুবে বাঙ্গালা—বাঙ্গালা ও বিহার

মোগল বাদসাহ আকবর বাঙ্গালার সঙ্গে বিহার ও উড়িষ্যা যোগ করিয়া তার নাম করেন, সুবে বাঙ্গালা বা বাঙ্গালা প্রদেশ। বিহারের প্রাচীন নাম ছিল মগধ। প্রাচীনকালেও মগধ আর গৌড অনেক সময় এক রাজার অধীন একই রাজ্যের মত ছিল, এবং এই দুই অঞ্চলে বরাবরই একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

এই ইংরেজ আমলেও আগে বিহার ও উড়িষ্যা বাঙ্গালার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, প্রায় আঠার বৎসর পূর্ব্বে, বিহার ও উড়িষ্যাকে পৃথক্ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই অবধি পশ্চিমে ও পূবে সামান্য দুই

একটা অঞ্চল ছাড়া মূল বাঙ্গালাই বাঙ্গালা দেশ হইয়াছে। মানচিত্রে এই বাঙ্গালা যে কতখানি তাহা তোমরা দেখিতে পাইবে।

বাঙ্গালার বর্ত্তমান ভাগ

শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্য বাঙ্গালাকে পাঁচটি অংশে ভাগ করা হইয়াছে, এই অংশগুলিকে বিভাগ বলে। এই পাঁচটি বিভাগের নাম বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী, রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম। প্রত্যেকটি বিভাগ আবার কয়েকটি করিয়া জেলায় বিভক্ত। এই জেলাগুলির মধ্যে আবার আরও ছোট কতকগুলি করিয়া ভাগ আছে, সেগুলিকে বলে মহকুমা। প্রত্যেকটি জেলায়, আর প্রত্যেকটি মহকুমায় শাসনকার্য্যের জন্য রাজকর্ম্মচারীরা বাস করেন। সেখানে মামলামোকর্দ্দমার বিচারের জন্য তাঁহাদের কাছারী বা আদালত আছে। এই স্থানগুলিকে সহর বলে। অনেক বাঙ্গালী,—কেহ রাজকর্ম্মসূত্রে, কেহ বা এই সব আদালতের উকিল মোক্তার হইয়া আজকাল সহরে থাকেন। অনেকের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারও সহরেই থাকে। কিন্তু গ্রামের সঙ্গে মমতার যোগ এখনও এমন আছে, যে, সহরে যে সব বাড়ীতে তাঁহারা থাকেন, সেগুলিকে 'বাড়ী' না বলিয়া সকলে 'বাসা' বলেন। গ্রামের পৈতৃক যে বাস্তু, তাহাকেই 'বাড়ী' বলেন। বাসা বলিতে অস্থায়ী ভাবে বাসের একটা জায়গা মাত্র বুঝায়।

বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বাঙ্গালীর তুলনা কেবল ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীতেও আর কোথাও মেলে কিনা সন্দেহ। বিদ্যায় আর আচার-ব্যবহারে প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালী জাতি অতি উন্নত। বাড়ীঘরের শ্রীসৌষ্ঠব, নিত্য স্নানে দেহের পরিচ্ছন্নতা, ঘরে ঘরে ঠাকুরপূজা, ব্রতনিয়ম, জপতপ,

সংকীর্ত্তন, আর পাল পার্ব্বণের ঘটা, বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে যেমন দেখা যায়, ভারতের কোথাও আর তেমন দেখা যাইবে না। বড় বড় কবি, বড় বড় পণ্ডিত, ও বড় বড় সাধক আর ধর্ম্মপ্রচারক, সেই সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত, বাঙ্গালায় যত জন্মিয়াছেন, এত আর ভারতের কোথাও কোনও প্রদেশে জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ। যেমন বাহিরের শ্রীতে, তেমনই অন্তরের শ্রীতেও, বাঙ্গালার মত সুন্দর, শিষ্ট আর উন্নত দেশ ভারতে আর কোথাও নাই।

তবে বাঙ্গালার একটা বড় নিন্দা আছে। বাঙ্গালার লোক অর্থাৎ বাঙ্গালীরা বড় শান্ত, কোমল-প্রকৃতি আর দেহে মনে দুর্ব্বল,—যোদ্ধা বীর এদেশে বেশী জন্মেন নাই।

ফলফুলে, শস্যে, জলে ভরা সমতল দেশ, দেশভরা এমন শান্ত শ্যামল শ্রী, স্নিগ্ধ নীল আকাশমণ্ডল, গ্রীষ্মে সেই আকাশে গা-জুড়ান মিঠা হাওয়া, আর শীতে এমন অবারিত মিঠা রোদ, এমন দেশের মানুষের স্বভাব মোটের উপরে শান্ত ও কোমল না হইয়াই পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া সকলেই দুর্ব্বল ও কোমল নহেন। বহু তেজস্বী মহাবীর এই বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী জাতির মধ্যেই জন্মিয়াছেন। তাঁহাদেরই কয়েক জনের কথা তোমাদের বলিব।

তোমাদের দেশমাতা তোমাদের মনে বড় মধুর একটা শান্ত কোমল ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়াই দেহকে অশক্ত অপটু করেন নাই। তোমরা যদি আজ দুর্ব্বল ও অপটু হইয়া পড়িয়া থাক—তবে সেজন্য তোমার দেশমাতা দায়ী নহেন। আর এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিবে, সাধারণ ব্যবহারে স্বভাবের গুণে ফুলের চেয়েও যে মানুষ কোমল, সেই মানুষই আবার প্রয়োজনের সময় বজ্রের চেয়েও কঠোর হইতে পারেন। আর এমন যে সব মানুষ তাঁরাই মানুষের মধ্যে মহাপুরুষ।

বিজয়সিংহ

(১)

বুদ্ধদেবের নাম তোমরা শুনিয়াছ। তিনি এ দেশে এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন। সে ধর্ম্মের নাম বৌদ্ধধর্ম্ম। সে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগের কথা, যখন মগধ বা বিহার অঞ্চলে বুদ্ধদেব তাঁহার এই ধর্ম্ম প্রচার করেন; আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে সিংহবাহু নামে তখন বড় একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার বিজয়সিংহ নামে এক পুত্র ছিলেন।

বনে গিয়া বনের পশু শিকার করা রাজা ও রাজপুত্রদের বড় একটা আমোদ। ঘোড়ায় রথে কি হাতীতে চড়িয়া, অনেক লোকজন লইয়া, মহাসমারোহে তাঁহারা বনে যাইতেন, বন উলটপালট করিয়া ব্যাঘ্র, সিংহ, হরিণ, শূকর, আরও বনের কত পশু তাঁহারা মারিতেন। এইরূপ পশুবধের নাম মৃগয়া।

বিজয়সিংহ একদিন তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া মৃগয়ায় যাইতেছেন। সাজসজ্জা করিয়া কেবল বাহির হইয়াছেন, এমন সময় রাজার একজন প্রতিহারী * আসিয়া কহিল, "কুমার! মহারাজ আপনাকে ডাকিয়াছেন।"

মৃগয়ায় যাইতেছেন, হঠাৎ এই বাধায় বিজয়সিংহ একটু বিরক্ত হইলেন; কহিলেন, "আমি যে মৃগয়ায় যাইতেছি।"

---

* অস্ত্র লইয়া এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক রাজাদের কাছে কাছে সর্ব্বদা থাকিয়া সংবাদ আনা নেওয়া করিত। এই সব স্ত্রীলোকদের বলিত প্রতিহারী। পুরুষ কেহ এই কাজ করিলে তাহাকে প্রতিহার বলিত।

প্রতিহারী কহিল, "তাহা ত দেখিতেছি। কিন্তু মহারাজের আদেশ, এখনই আপনাকে রাজসভায় যাইতে হইবে।"

বিজয় সিংহ উত্তর করিলেন, "কেন? কি প্রয়োজনে?"

"প্রয়োজনের কথা মহারাজ নিজেই বলিবেন। আমি তাঁহার আদেশ আপনাকে জানাইতেছি মাত্র।"

সঙ্গীদের মধ্যে বীরসেন নামে একজন ছিলেন বিজয়সিংহের বড় প্রিয়পাত্র। একটু হাসিয়া তিনি কহিলেন, "মৃগয়ায় যাওয়া আর হইল না, কুমার। রাজসভায় আপনার বিচার হইবে।"

"বিচার! আমার বিচার? তুমি কি পাগল হইয়াছ বীরসেন? আমি রাজপুত্র।"

"কিন্তু রাজা ত নহেন। রাজপুত্রও রাজার একজন প্রজা মাত্র। অপরাধ করিলে রাজাকে তাঁহারও বিচার করিতে হয়।"

"অপরাধ! আমি রাজপুত্র, আমার অপরাধ! তার আবার বিচার! তুমি উপহাস করিতেছ, বীরসেন!"

বীরসেন কহিলেন, "আপনি মৃগয়া করিতে যান, প্রজাদের শস্যের ক্ষেত নষ্ট করেন, গ্রাম লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলেন, জোর করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করেন, অর্থ আদায় করেন, না দিলে মারধর করেন।"

"তা করি। আমাদের পথে তাহাদের ক্ষেত পড়িলে, ক্ষেত ভাঙ্গিয়াই যাইতে হয়। খাবার লাগে, অর্থও লাগে, কেন আদায় করিব না? যখন দিতে চায় না, গ্রাম লুঠ করিয়া, ঘর দরজা ভাঙ্গিয়া আদায় করিতে হয়, মারধরও করিতে হয়। কেন করিব না?"

বীরসেন কহিলেন, "কিন্তু প্রজারা এ সব সহ্য করিতে চায় না। শুনিয়াছি মহারাজের কাছে তাহারা অভিযোগ করিয়াছে।"

"অভিযোগ করিয়াছে। এত দুঃসাহস তাদের! এ সব কি সত্য

প্রতিহারী ? প্রজাদের কে কি আসিয়া বলিয়াছে, আর তারই বিচারের জন্য মহারাজ আমাকে ডাকিয়াছেন ?"

প্রতিহারী উত্তর করিল, "আপনাকে এখনই রাজসভায় যাইতে হইবে, মহারাজের এই আদেশ মাত্র আমি লইয়া আসিয়াছি। আর কিছুই বলিতে পারিব না কুমার।"

"হুঁ! বুঝিয়াছি।" এই বলিয়া কিছুক্ষণ বিজয় সিংহ ভ্রূকুটি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর কহিলেন, "যাও প্রতিহারী! মহারাজকে গিয়া বল, আমি মৃগয়ায় যাইতেছি। রাজসভায় যাইবার অবসর এখন হইবে না। চল সকলে।"

বলিয়াই বিজয়সিংহ তাঁহার শিঙ্গাটিতে ফুঁ দিলেন। সঙ্গীরা সকলে লাগাম ধরিয়া যার যার ঘোড়ায় ঠিক হইয়া বসিল। তারপর আর এক ফুঁ! ঘোড়াগুলি অমনই খট্‌খট্ শব্দে ছুটিয়া চলিল। একটু দূরে যাইতেই একটা হাসির রোল উঠিল।

প্রতিহারী অবাক্ হইয়া চাহিয়া ছিল। হাসির রোল শুনিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল, "ভাল করিলে না কুমার! ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে। মহারাজ তোমাকে ক্ষমা করিবেন না।"

(২)

মহারাজ সিংহবাহু এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন, তখনই একজন সেনানীকে ডাকিয়া কহিলেন, "যাও; বিজয়সিংহকে আর তার সঙ্গীদের সব বন্দী করিয়া রাজসভায় লইয়া আইস।"

সেনানী কহিলেন, "কুমার বিজয়সিংহ যদি বাধা দেন ?"

"কুমার বিজয়সিংহ ? না, সে আর কুমার নয়! শুধু বিজয়সিংহ; আমার—আমার অবাধ্য প্রজা। যাও, এখনই তাকে ধরিয়া আন।"

সেনানী আবার কহিল, "কিন্তু যদি তিনি বাধা দেন ?"

রাজা উত্তর করিলেন, "বাধা দিবে ? এত সাহস তার হইবে ?"

"হইবে বলিয়াই ত মনে হয়, মহারাজ।"

"অসম্ভব নয় ! যদি দেয়, জীবিত কি মৃত যে অবস্থায়ই হউক তাকে আজ এই রাজসভায় ধরিয়া আনিবে ! যাও।"

অভিবাদন করিয়া একদল সেনা লইয়া সেনানী চলিয়া গেলেন।

বিজয়সিংহ কিন্তু ধরা দিলেন না। যখন দেখিলেন, রাজার একদল সেনা তাঁহাকে বন্দী করিতে আসিয়াছে, তরোয়াল খুলিয়া প্রস্তুত হইয়া তিনি দাঁড়াইলেন। সঙ্গীরাও সকলে তরোয়াল খুলিয়া তেমনই প্রস্তুত হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

সেনানী কহিলেন, "কুমার ! রাজার আদেশে রাজার এই সেনা লইয়া আমি আসিয়াছি। বাধা দিলে যুদ্ধ করিয়াই আপনাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

"যদি পার, তাই কর ! সেনা লইয়া আসিয়াছ, যুদ্ধই তবে কর।"

"সহজে আপন ইচ্ছায় তবে আপনি যাইবেন না ?"

"না !"

সেনানী আদেশ করিলেন ; সেনার দল বিজয় সিংহকে আর তাঁহার সঙ্গীদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। দুই পক্ষে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল। রাজার অনেক সৈন্য আর বিজয়সিংহেরও কয়েকজন সঙ্গী মরিল। কিন্তু যত বড়ই যোদ্ধা হউক, অনেক লোকের সঙ্গে অল্পলোক বেশীক্ষণ যুঝিতে পারে না। বিজয়সিংহের গায়ে কেহ আঘাত করে নাই। রাজার সৈন্যদের লক্ষ্য ছিল, তাঁহার হাতের অস্ত্রটিকে কাড়িয়া লওয়া কি ভাঙ্গিয়া ফেলা। তাই করিয়া অনেক ধস্তাধস্তির পর তাহারা শেষে তাঁহাকে বন্দী করিল। সঙ্গী যাহারা

জীবিত ছিল, ইহার পর তাহাদিগকে বন্দী করা তেমন কিছু শক্ত হইল না। শেষের দিকে সেনানী নিজেও মারা পড়িলেন।

(৩)

সৈন্যেরা তখন বিজয়সিংহকে আর তাঁহার সঙ্গীদের রাজসভায় লইয়া আসিল।

সিংহবাহু কুপিতকণ্ঠে কহিলেন, "বিজয়সিংহ!"

"আজ্ঞা করুন, মহারাজ!"

"আজ্ঞা করুন! হাঁ, এখন বন্দী হইয়াছ, তাই বলিতেছ, আজ্ঞা করুন। কিন্তু কিছু আগে দুইবার যে আজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা পালন করিয়াছিলে?"

"না!"

"কেন?"

"আমার ইচ্ছা হয় নাই।"

"আর এখন? এখন ইচ্ছা হইবে?"

বিজয়সিংহ বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "আমি মহারাজের বন্দী। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনও মূল্য নাই। মহারাজের যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন।"

সিংহবাহু কহিলেন, "তোমার বিরুদ্ধে প্রজাদের অনেক অভিযোগ ছিল। বিচারের জন্য রাজসভায় উপস্থিত হইতে তোমাকে আদেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তুমি মৃগয়ায় চলিয়া গেলে।"

বিজয়সিংহ উদ্ধত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমি রাজপুত্র, পরে রাজাও হইব। সাধারণ প্রজাদের মত কোনও অপরাধের বিচার আমার হইতে পারে না।"

সিংহবাহু কহিলেন, "তুমি রাজা হইবে বলিয়া গর্ব্ব করিতেছ

বিজয় সিংহ, আর এইটুকু জ্ঞান তোমার নাই যে, রাজপুত্রও রাজার প্রজা, অপরাধ করিলে অন্য প্রজার মত তারও বিচার হওয়া চাই ? যাহাই হউক, তোমার কোনও অপরাধের বিচার হইতে পারে কিনা, তার মীমাংসার জন্যও আমার আদেশে রাজসভায় তোমার আসা উচিত ছিল।"

"হাঁ, স্বীকার করিতেছি, তাই ছিল মহারাজ।"

"কিন্তু তুমি আ'স নাই। অগত্যা তোমাকে ধরিয়া আনিতে আমাকে সেনা পাঠাইতে হইল। সেই সেনার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করিয়াছ, তাহাতে অনেক সৈন্যের, আমার সেনানীর পর্য্যন্ত প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।"

"আমার সঙ্গীও অনেকে মরিয়াছে।"

সিংহবাহু কহিলেন, "তার জন্যও তুমি দায়ী, আমি নই : যাহা হউক, এই যে অপরাধ তুমি করিয়াছ ইহাকে রাজবিদ্রোহ বলে জান ?"

"হইতে পারে !"

"হইতে পারে ! এখনও সন্দেহ তোমার আছে ? সন্দেহের কিছু নাই বিজয়সিংহ, ইহাই রাজবিদ্রোহ, আর রাজবিদ্রোহের দণ্ড, মৃত্যু !"

বিজয়সিংহ কহিলেন, "মহারাজ বিচারক। আমি যদি রাজবিদ্রোহ করিয়া থাকি, সেই মৃত্যুদণ্ডই আমাকে দিন।"

"হাঁ, তাই দিলাম।"

সকলে চমকিয়া উঠিলেন ! কি সর্ব্বনাশ ! রাজকুমার বিজয়সিংহের মৃত্যুদণ্ড ! একদিকে দোষ যতই থাক, আর অপরাধ এখন যত বড়ই হউক, সরল, সত্যবাদী, তেজস্বী আর মহাবীর যোদ্ধা বলিয়া সকলেই বিজয়-সিংহকে বড় ভালবাসিতেন। সকলেই মনে করিতেন, প্রথম বয়সের এই সব দোষ ত্রুটি সারিয়া গেলে, কালে বিজয়সিংহ সকল প্রজার অতি প্রিয় খুব বড় একজন রাজা হইবেন। আর সেই বিজয়সিংহ কিনা আজ রাজদণ্ডে ঘাতকের হাতে প্রাণ দিবেন !

রাজা কহিলেন, "যাও, ইহাকে কারাগারে লইয়া যাও। কাল প্রত্যুষেই ইহার প্রাণদণ্ড হইবে।"

বৃদ্ধ মন্ত্রী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত দুটি জোড় করিয়া কহিলেন, "একটি প্রার্থনা আছে, মহারাজ!"

"কি প্রার্থনা মন্ত্রী? না, পুত্র বলিয়া বিজয়সিংহকে মুক্তি দিতে পারিব না। আমার এই আসনের সম্মুখে পুত্র আর যে কোনও প্রজা, দুইই সমান। কোনও প্রজা আজ এই অপরাধ করিলে যে দণ্ড দিতাম, বিজয়সিংহকে সেই দণ্ডই দিয়াছি।"

মন্ত্রী কহিলেন, "বিদ্রোহী আর নরঘাতক যে, মৃত্যুদণ্ডই তার হইয়া থাকে। কিন্তু মহারাজ ইচ্ছা করিলে, তাকে নির্ব্বাসিতও করিতে পারেন।"

রাজা একটু ভাবিলেন। ভাবিয়া শেষে কহিলেন, "হাঁ, তা পারি। তাহা হইলে তোমার ইচ্ছা কি মন্ত্রী?"

মন্ত্রী কহিলেন, "সত্য যদি বলি, আমার ইচ্ছা কুমারকে ক্ষমা করুন।"

"না, তা করিব না।"

"তবে প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া অগত্যা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করুন। কুমারের বয়স অল্প, এ বয়সে এরূপ দোষত্রুটি অনেকেরই হইয়া থাকে। কিন্তু মহারাজ নিজেও জানেন, কুমারের স্বভাবে বহু গুণও আছে। ইহার মত শক্তিমান্ ও তেজস্বী বীর যুবা বড় দেখা যায় না। না বুঝিয়া বড় একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছেন; শোধরাইবার অবসর ইহাকে দিন। দিব্য চক্ষে আমি দেখিতে পাইতেছি, যেখানেই যান, আপন শক্তিতে কুমার রাজ্যেশ্বর হইবেন। আর স্বভাবের গুণগুলি যখন পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে, দোষগুলি দূর হইবে, প্রজারা তখন ইহাকে ধন্য ধন্য করিবে, কীর্ত্তিতে চিরদিন ইনি অমর হইয়া থাকিবেন। আমরা হারাইলাম, মহারাজ! কিন্তু পৃথিবী যেন এ রত্ন আজ অকালে না হারায়।"
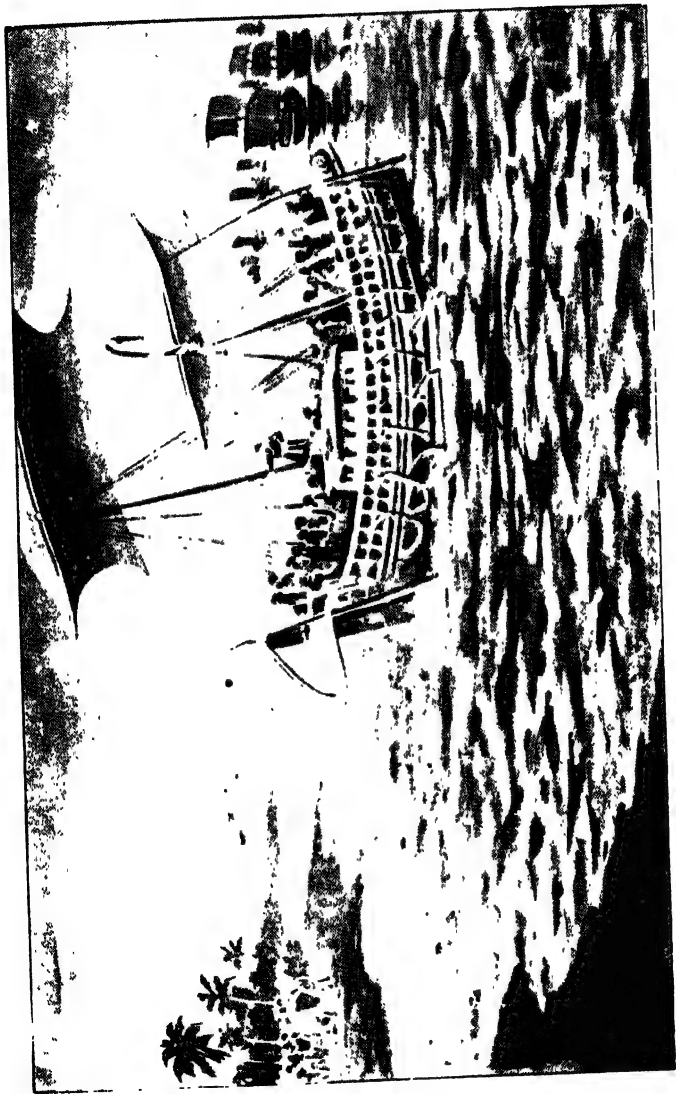
বিজয় সিংহের সমুদ্র যাত্রা

রাজার চোখে জল আসিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি আপনাকে সামলাইয়া লইলেন। ধীরে ধীরে শেষে কহিলেন, "তাই তবে হউক। বিজয়সিংহ! তোমাকে নির্ব্বাসিত করিলাম। আজ হইতে তিনদিনের মধ্যে তুমি বাঙ্গালা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।"

বিজয়সিংহ উত্তর করিলেন, "যে আজ্ঞা মহারাজ! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। মন্ত্রী মহাশয়, আপনাকেও অভিবাদন করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার কথা যেন সব সত্য হয়। সেই গৌরবেই আমার নির্ব্বাসন দণ্ড সার্থক হউক, মা মাতৃভূমি বাঙ্গালার নিকটে এই প্রার্থনা করিয়াই আমি চিরবিদায় লইতেছি।"

(৩)

বাঙ্গালার সাত শত বীর বিদেশযাত্রার জন্য সাজিল, তাহারা বিজয়-সিংহের সঙ্গে যাইবে। বিজয়সিংহ কহিলেন,—"মহারাজ যদি অনুমতি করেন, তবেই তোমাদের সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি; নতুবা নয়।"

রাজবাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহারা বলিয়া পাঠাইল, "মহারাজ! অনুমতি করুন, আমরা কুমার বিজয়সিংহের সঙ্গে যাইব।" রাজা অনুমতি দিলেন। সাত শত বীর অনুচর লইয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া বিজয়সিংহ বরাবর দক্ষিণদিকে চলিয়া গেলেন। তৃতীয় দিনে তাঁহারা সমুদ্রের তীরে তাম্রলিপ্ত * বন্দরে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে তখন অনেক বণিক্‌ বাস করিত। এই বন্দরে বড় বড় অনেক বাণিজ্যের নৌকা বা জাহাজ বাঁধা থাকিত। এই সব জাহাজে চড়িয়া বণিকেরা সমুদ্র পার হইয়া নানা দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত।

---

* মেদিনীপুর জেলায় তমলুক সহর যেখানে, সেইখানে এই প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্ত ছিল।

পিছনে শ্যামল বাঙ্গালা দেশ, আর সম্মুখে নীল মহাসমুদ্র। শ্যামল সুন্দর এই বাঙ্গালা দেশ যদি ছাড়িতেই হইল, সুনীল সুন্দর ঐ সাগরেই তরী ভাসাইলে মন্দ কি হয়? ঐ সাগরপারে এমনই সুন্দর শ্যামল কোনও দেশ যদি পাওয়া যায়, তবে সেই দেশটিকে আর একটি এমন বাঙ্গালা করিয়া কি তোলা যায় না? সাত শত বীর বাঙ্গালী তাঁহার সঙ্গে। ইহাদের লইয়া যদি সেই দেশে গিয়া উঠা যায়, যাহাদের যে দেশই হউক না, এই বাঙ্গালী বীরদের হাতে আসিবেই। তার পর বাঙ্গালীর বুদ্ধি, বাঙ্গালীর বিদ্যা, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, সেই দেশকে আর একটি বাঙ্গালা করিয়া তুলিবে। হাঁ, নীল ঐ মহাসাগরেই ভাসিব। এক বাঙ্গালা ছাড়িতেছি, দেখি যদি আর একটা বাঙ্গালা সাগর পারে কোথাও গড়িয়া লইতে পারি।

এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া বিজয়সিংহ সঙ্গীদিগকে জানাইলেন। আনন্দে সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল,—"হাঁ, চলুন কুমার, সাগর পারেই যাই! এই রকম দেশ যদি কোথাও পাই, সেই দেশকে আমরা নূতন এক বাঙ্গালা করিয়া লইব। জয় বাঙ্গালীর জয়! জয় কুমার বিজয়সিংহের জয়!"

তাম্রলিপ্তের বড় বড় কয়েকজন বণিকের সঙ্গেও এবিষয়ে কথা হইল। তাঁহারা বলিলেন, একটু পশ্চিমে ঘুরিয়া বরাবর দক্ষিণে গেলে এমনই সুন্দর শ্যামল একটি দ্বীপ পাওয়া যাইবে। কূলের কাছে কেবল নারিকেল গাছের সারি; ভারতবর্ষের দক্ষিণ কোণে যে কুমারী তীর্থ আছে, তাহারই কতকটা দক্ষিণে সমুদ্রপারে এই দ্বীপ। কুমারী হইতে এই দ্বীপ পর্য্যন্ত অনেকগুলি পাহাড়ের চূড়া সাগর জলে মাথা তুলিয়া আছে, দেখা যায়। লোকে বলে, রামচন্দ্র যে সেতু বাঁধিয়া লঙ্কায় যান, এগুলি তাহারই অংশ।

শুনিয়া বিজয় সিংহ বলিয়া উঠিলেন,—"লঙ্কা! এই কি রামায়ণের সেই লঙ্কাদ্বীপ?"

"হাঁ, কুমার! এই সেই লঙ্কাদ্বীপ।"

"ভাল, আমি এই লঙ্কাদ্বীপেই তবে যাইব। নির্ব্বাসিত রামচন্দ্র গিয়াছিলেন, সমস্ত দক্ষিণ ভারতের পথ হাঁটিয়া, শেষে সেতু বাঁধিয়া; আর নির্ব্বাসিত আমি যাইব বাঙ্গালা হইতেই বাঙ্গালার জাহাজে বরাবর সাগর পার হইয়া!"

সঙ্গী একজন হাসিয়া কহিল,—"রামচন্দ্র গিয়াছিলেন সীতা উদ্ধারের জন্য! আর আপনি?"

বিজয়সিংহও হাসিয়া কহিলেন, "আমিও যাইব আমার হারানো রাজ্যলক্ষ্মীকে নূতন করিয়া সেখানে পাইবার জন্য।"

শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। বণিক্ একজন কহিলেন, "তাহাই হউক কুমার! লঙ্কায় আপনার রাজ্যলক্ষ্মীর আসন স্থাপিত হউক! কিন্তু যাইতে হইলে জাহাজ ত চাই কুমার।"

"হাঁ, তা চাই বই কি? তোমরা দাও। আমি যথাযোগ্য মূল্য দিব।"

"মূল্য চাই না, কুমার। যে কয়খানা প্রয়োজন হয়, আপনি বাছিয়া নিন। আপনি সেদেশে রাজা হইলে, আমাদের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। তাই যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া মনে করিব।"

সাত শত লোক স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে, এমন কতকগুলি জাহাজ বিজয়সিংহ বাছিয়া লইলেন। পরদিন রাত্রি প্রভাতেই বন্দর ছাড়িয়া জাহাজগুলি সমুদ্রে ভাসিল।

(৪)

তখন কল ছিল না, জাহাজ চলিত পালে আর দাঁড়ে। নাবিকরা পথ চিনিত; দক্ষিণ ভারতের পূর্ব্ব উপকূলের কাছ দিয়া জাহাজগুলি কত নূতন নূতন দেশ পার হইয়া বরাবর দক্ষিণে চলিল। এই ভাবে একমাস

কাটিয়া গেল। তারপর জাহাজগুলি লঙ্কায় গিয়া পৌঁছিল। লঙ্কার ভাষা জানিত, এমন দুই একজন বণিক্ সঙ্গে গিয়াছিল। ইহাদের কাছে বিজয়-সিংহ, এবং সঙ্গীরাও কেহ কেহ, লঙ্কার ভাষাও কিছু কিছু শিখিয়া লইলেন।

এত গুলি জাহাজে চড়িয়া কাহারা কোথা হইতে আসিল? বাণিজ্য করিতে নানা দেশের লোক মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে বটে,কিন্তু ইহাদিগকে ত বণিক্ বলিয়া মনে হয় না। যোদ্ধা বীরের মতই দেখায়। তবে কি বিদেশী কোনও রাজার সেনা লঙ্কা জয় করিতে আসিয়াছে? তীরে ছোট একটি বন্দর ছিল। বন্দরের লোকেরা রাজবাড়ীতে সংবাদ দিল। রাজা একজন বিচক্ষণ দূত পাঠাইলেন; সঙ্গে একদল প্রহরীও আসিল। রাজার দূত যাঁহারা, তাঁহারা নানা দেশে যান, নানা দেশের ভাষায় কথাও বলিতে পারেন। দূতকে দেখিয়া বিজয়সিংহ কয়েকজন অস্ত্রধারী সঙ্গী লইয়া তাঁহার জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলেন। অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "নমস্কার মহাশয়! আপনি কি এদেশের রাজার কোনও লোক?"

দূত কহিলেন "হাঁ মহাশয়, আমি তাঁহার দূত। আপনারা কে? কোথা হইতে আসিতেছেন?"

বিজয়সিংহ কহিলেন "আমরা বাঙ্গালী; বাঙ্গালা হইতে আসিয়াছি।"

"বাঙ্গালা হইতে আসিতেছেন? বাঙ্গালা হইতে বণিকেরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে। আপনারা কি বণিক্?"

"না, বণিক্ নই; বাণিজ্য করিতে আমরা আসি নাই।"

"তবে কি প্রয়োজনে আসিয়াছেন? লঙ্কা দেখিতে?"

"না দেখিতে নয়—লঙ্কায় বাস করিতে আসিয়াছি।"

অতি বিস্মিত হইয়া দূত কহিলেন, "বাস করিতে আসিয়াছেন! এত গুলি লোক এক সঙ্গে! কেন? এত বড় দেশ বাঙ্গালায় কি আপনাদের থাকিবার স্থান হইল না?"

"না, তা হইল না। তাই ভিন্নদেশে আসিয়াছি।"

"ভিন্ন দেশ ত বাঙ্গালার কাছেও অনেক ছিল। সমুদ্র পার হইয়া এতদূর কেন আসিয়াছেন ?"

"আমাদের ইচ্ছা।" একটু হাসিয়া বিজয়সিংহ এই উত্তর করিলেন।

দূত কহিলেন, "ইচ্ছা ! ইচ্ছা হইল আর অমনই চলিয়া আসিলেন ? বলিতেছেন, নিজেদের দেশ বাঙ্গালায় আপনাদের স্থান হইল না। কিন্তু এতদূর দেশ এই লঙ্কায় আপনাদের যে স্থান হইবে ইহা কিসে বুঝিলেন ?

"সহজে না হয়, স্থান করিয়া লইব। এই ভরসা করিয়াই আসিয়াছি।"

"কি, তবে কি জোর করিয়া লঙ্কা দখল করিতে চান ? কত লোক আপনার সঙ্গে আছে ?.

"সাত শত।"

"সাত শত লোক লইয়া লঙ্কা জয় করিতে আসিয়াছেন ?"

বিজয়সিংহ উত্তর করিলেন, "সে সব কথার প্রয়োজন এখন কিছু নাই। আপনি মহারাজকে গিয়া জানান, সাত শত বাঙ্গালী আমরা এই লঙ্কায় বাস করিব বলিয়া আসিয়াছি। তিনি কি বলেন তাই জানিতে চাই।"

"যে আজ্ঞা। শীঘ্রই মহারাজের আদেশ জানিতে পারিবেন।"

(৫)

বিজয়সিংহ তখন সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, "বীর-বাঙ্গালী ভাই সব ! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।"

সঙ্গীদের মধ্যে একজন ছিলেন বীরসেন, আর একজন চারুদত্ত।

চারুদত্ত কহিলেন, "যুদ্ধ ? আগেই যুদ্ধ ? দেখুন না, কুমার, রাজা কি বলিয়া পাঠান ?"

বীরসেন হাসিয়া কহিলেন, "চারুদত্ত, রাজার যদি একটু বুদ্ধি থাকে ত,

বলিয়া কিছুই পাঠাইবেন না, পাঠাইবেন একদল সেনা। কুমার খুব সাবধানে কথা বলিতে পারেন নাই। সাবধান হইয়া কথা বলিবার কৌশলই কুমার জানেন না। দূতকে স্পষ্ট বুঝিতে দিয়াছেন, সহজে না দিলে জোর করিয়া আমরা থাকিব। বিদেশ হইতে সাত শত অস্ত্রধারী লোক আসিয়াছে, জোর করিয়া দেশে থাকিতে চায়। থাকিতে দিলে দেশ যে ইহারা দখল করিয়া লইবে, একটু বুদ্ধি থাকিলে সকলেই ইহা বুঝিতে পারে।"

হাসিয়া বিজয়সিংহ কহিলেন, "হাঁ, ঠিক বলিয়াছ বীরসেন। রাজা আমাদের থাকিতে দিতে পারেন না,—তাড়াইয়া দিতেই চাহিবেন। তবে একেবারেই আক্রমণ না করিয়া আগে একবার বলিয়া পাঠাইতে পারেন, অবিলম্বে তোমরা চলিয়া যাও। কিন্তু এতদূর আসিয়া কি রাজার একটা হুকুমেই তোমরা চলিয়া যাইবে ?"

অনেকেই বলিয়া উঠিলেন "না! কখনও না! তবে আসিয়াছি কেন ? যুদ্ধ করিয়া আমরা লঙ্কা দখল করিব। কুমারকে লঙ্কার রাজা করিব। লঙ্কাকেই বাঙ্গালা করিয়া তুলিব। জয় কুমার বিজয়সিংহের জয়! জয় বাঙ্গালার জয়!"

সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, জয় কুমার বিজয়সিংহের জয়। জয় বাঙ্গালার জয়!"

(৬)

রাজার লোক আসিয়া জানাইল, লঙ্কায় বাঙ্গালীদের থাকিবার স্থান হইবে না। এতদূর হইতে আসিয়াছে, ইচ্ছা হইলে দুই একদিন বিশ্রাম করিতে পারে কি বেড়াইয়া দেশটা দেখিতে পারে। তার পরেই তাহাদের চলিয়া যাইতে হইবে!

বিজয়সিংহ হাসিয়া কহিলেন, "ভাল কথা। আমরা তবে বিশ্রাম করি আর বেড়াইয়াও দেখি। যদি জায়গা পাই থাকিব, না হয় চলিয়া যাইব।"

জাহাজগুলি সরাইয়া কিছুদূরে একটু নিরালা জায়গায় লওয়া হইল। কাছেই কয়েকটা টিলা আর মধ্যে দুর্গম বন। এইখানে বিজয়সিংহ ছাউনী ফেলিলেন। এক দিনের মধ্যেই বন হইতে বড় বড় গাছ কাটিয়া সম্মুখে এমন ভাবে সেগুলি ফেলিয়া রাখা হইল যে, সহজে কেহ ছাউনীর কাছে না আসিতে পারে। দুই দিকে খালি বন আর টিলা, একদিকে জাহাজে ঘেরা সমুদ্রতীর,আর সম্মুখে এই গাছের প্রাচীর; স্থানটা একটা দুর্গের মতই হইল।

রাজা যখন দেখিলেন, বাঙ্গালীরা এমন খাসা একটা দুর্গের মত ছাউনী করিয়া বসিয়াছে, ফিরিয়া যাইবার নামও করে না, তখন তাঁহার ভয় হইল। নিশ্চয়ই ইহারা অতি শক্তিমান্ ও কৌশলী যোদ্ধা। নতুবা মাত্র সাত শত বিদেশী লোকের এ দুঃসাহস হয় না। এক দল সেনা তিনি পাঠাইলেন। বাঙ্গালীরা বড় ভাল তীরন্দাজ ছিল। গাছের আড়াল হইতে এমনভাবে তীর ছুঁড়িতে লাগিল যে অনেক লোক হারাইয়া লঙ্কার সেনা শেষে হটিয়া আসিল। আরও বড় এক দল সেনা আসিল, তারাও হটিয়া গেল। কয়েক দিন এইরূপ যুদ্ধ চলিল ক্রমাগত এইভাবে হটিয়া লঙ্কার লোকেরা বড় দমিয়া পড়িল। এদিকে বাঙ্গালীদের সাহস বল ভরসা শতগুণে বাড়িয়া উঠিল।

তারপর কয়েকদিন নূতন সেনা আর আসিল না। বিজয়সিংহ সংবাদ পাইলেন, পিছনের বনের মধ্য দিয়া পথ করিয়া অতি বৃহৎ একদল সেনা আসিতেছে। ইহাও বুঝিলেন, রাজপুরীতে অধিক সেনা নাই। তখন সাত শত অনুচর লইয়া বিজয়সিংহ সেই গাছের আড়াল হইতে বাহির হইলেন,

এবং অতি বেগে গিয়া রাজপুরী আক্রমণ করিলেন। সেনা যাহা ছিল, এই আক্রমণের বেগ রোধ করিতে পারিল না। রাজা নিজেও যুদ্ধে মারা গেলেন; রাজপুরী বাঙ্গালীদের দখলে আসিল।

যে সৈন্যদলটি বনের পথে ছাউনী আক্রমণ করিতে যাইতেছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিল। আসিয়া রাজপুরী অবরোধ করিল। কয়েকদিন যাবৎ ইহাদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। কিন্তু রাজপুরী, সেইসঙ্গে রাজপুরীর সব অস্ত্রশস্ত্র আর ধনরত্ন দখলে পাইয়া বাঙ্গালীদের বল বিক্রম এত বাড়িয়া গিয়াছিল, যে লঙ্কার এই সেনা শেষে হার মানিয়া বিজয়সিংহের বশীভূত হইল।

(৭)

মহাসমারোহে সেইদিনই লঙ্কার রাজপাটে বিজয়সিংহের অভিষেক হইল।

নির্ব্বাসনের সময় বাঙ্গালার মন্ত্রী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই সত্য হইল। দোষ যাহা ছিল সব সারিয়া গেল,—গুণগুলিই চরিত্রে এমন ভাবে ফুটিয়া উঠিল যে, অল্পদিনেই বিজয়সিংহ লঙ্কাবাসীদের অতি প্রিয় রাজা হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাহাদের চালচলনও বাঙ্গালীদের মত হইয়া উঠিল, বাঙ্গালীদের ভাষাতে তাহারা কথা বলিতে আরম্ভ করিল। বিজয়সিংহ রাজা, তাই লঙ্কার নামও বদলাইয়া হইল সিংহল।

সকলেই রামায়ণ পড়ে, রামায়ণের কথা জানে,—তাই ভারতবর্ষে লঙ্কার নামটা প্রচলিত আছে। কিন্তু লঙ্কার লোকেরাও আপনাদের দেশকে বলে সিংহল, আর নিজেদের বলে সিংহলী। সমস্ত পৃথিবীতেও এই দ্বীপ সিংহল নামে পরিচিত। সিংহলীদের চেহারাও দেখিতে অনেকটা বাঙ্গালীর মত। তাহাদের ভাষার সঙ্গেও বাঙ্গালা ভাষার অনেক মিল পাওয়া যায়।

দক্ষিণভারতের এক রাজা আদর করিয়া বিজয়সিংহের সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ দেন। কিন্তু বিজয়সিংহের কোনও পুত্রসন্তান হয় নাই। বাঙ্গালায় লোক পাঠাইয়া তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাসুদেবকে তিনি লঙ্কায় আনান, এবং মৃত্যুকালে তাঁহার হাতেই রাজ্যভার দিয়া যান।

বহু শত বৎসর বাঙ্গালী রাজপুত্র পাণ্ডুবাসুদেবের বংশধরগণ সিংহলে রাজত্ব করেন। ইহার প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে মহারাজ অশোক ভারতের সম্রাট্ হইয়াছিলেন। অশোক বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহিন্দ এবং কন্যা সংঘমিত্রা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হইয়া সিংহলে যান এবং সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করেন। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত সিংহলীরা বৌদ্ধ।

আরও কয়েক শত বৎসর পরে, ভারতের সম্রাট পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্রের সঙ্গে সিংহলের এক রাজকন্যা রত্নাবলীর বিবাহ হয়,—এইরূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে।

চিতোরের রাণী পদ্মিনীর গল্প তোমরা পড়িয়াছ। এই পদ্মিনীও ছিলেন সিংহলের এক বাঙ্গালী রাজকন্যা আর পদ্মিনীর এক ভাইপো ছিল বাদল, সে-ও সিংহলেরই এক বাঙ্গালী বালকবীর!

শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত

বিজয়সিংহ যে সময় সিংহল জয় করেন, তার কিছু পর হইতে হাজার বৎসরেরও অধিককাল মগধ বা বিহারে অনেক বড় বড় সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। অনেক বড় বড় সম্রাট্ এই দেশ হইতে ভারতবর্ষ শাসন করেন। এই মগধের সঙ্গে বাঙ্গালার তখন এমন একটা যোগ ছিল যে দুইটিকে প্রায় এক রাজ্য বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইত। বাঙ্গালার সঙ্গে বিহারের এই রকম একটা যোগ বরাবর মুসলমান আমলেও ছিল। এই ইংরাজ আমলেও ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ও বিহারকে এক লাটসাহেবের শাসনে একই প্রদেশ বলিয়া ধরা হইত।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত নামে এক রাজবংশের সম্রাট্রা ভারত শাসন করিতেন। পাটলীপুত্র বা পাটনা ইঁহাদের রাজধানী ছিল। মধ্য এসিয়া হইতে হুন নামে অতি বর্ব্বর ও দুর্দ্দান্ত একজাতি আসিয়া তখন ভারত আক্রমণ করিতে থাকে। ইহাদের সঙ্গে অনেক বৎসর যাবৎ ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া গুপ্ত রাজারা বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়েন,—এবং তাঁহাদের সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য হয়। এই গুপ্ত বংশের এক শাখা পূর্ব্বঅঞ্চলে সরিয়া আসিয়া বাঙ্গালার রাজা হন, আর একটি শাখা দক্ষিণ পশ্চিমে গিয়া মালব দেশের রাজা হন। ছোট ছোট আরও দুই একটি শাখা পাটলীপুত্র ও তাহার কাছে ছোট ছোট রাজ্যে রাজত্ব করিতেন।

বাঙ্গালার এক গুপ্ত রাজা ছিলেন মহাসেনগুপ্ত এবং ইঁহার পুত্র ছিলেন মহাবীর শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত। ইঁহার দেহ ছিল সুগঠিত ও বলিষ্ঠ, ইঁহার মাথায় ছিল তাম্রবর্ণের একরাশি কেশ। ইনি একজন প্রিয়দর্শন পুরুষ ছিলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে—এখন হইতে প্রায়

চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বে—ইনি বাঙ্গালার রাজা হন। উত্তরে মগধের অনেক অংশ ইনি আপন অধিকারে আনেন,—দক্ষিণপূর্ব্বে উড়িষ্যা অঞ্চলের রাজারাও ইঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। উত্তর বাঙ্গালায় কর্ণস্থবর্ণ নগরে ইঁহার রাজধানী ছিল। মুরসিদাবাদের নিকটে কানসোনা নামে একটি গ্রাম আছে। ইহাই ছিল প্রাচীন কর্ণস্থবর্ণ।

তখন মালবের রাজা ছিলেন দেবগুপ্ত। উত্তর ভারতে পাঞ্চাল দেশের রাজধানী ছিল কান্যকুব্জ বা কনোজ, এবং সেখানকার রাজা ছিলেন গ্রহ-বর্ম্মা। পাঞ্চালের পশ্চিমে আর একটি রাজ্য ছিল থানেশ্বর (স্থান্বীশ্বর)। সেখানে রাজা ছিলেন প্রভাকরবর্দ্ধন। এই প্রভাকরবর্দ্ধনের দুইটি পুত্র ছিলেন রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন। রাজ্যশ্রী নামে ইঁহার একটি কন্যাও ছিলেন। কান্যকুব্জের রাজা গ্রহবর্ম্মার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। এদিকে আবার বাঙ্গালার পূবে কামরূপ বা আসামের রাজা ছিলেন ভাস্করবর্ম্মা।

থানেশ্বরের পশ্চিমে পঞ্জাব অঞ্চল তখনও হুনদের অধিকারে ছিল। হুনদিগকে দূর করিয়া দিয়া এবং দক্ষিণেও মালবের নিকট পর্য্যন্ত অনেক দেশ জয় করিয়া থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন অতি শক্তিশালী হইয়া উঠেন। গুপ্তসাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্দ্ধনই নূতন একটা সাম্রাজ্য উত্তরভারতে স্থাপন করিবেন, অনেকের মনে ধারণা এইরূপ হইল। কিন্তু গুপ্তবংশের বড় দুইজন রাজা এখনও ভারতে বর্ত্তমান।—ইঁহারা কি সেই গুপ্তসাম্রাজ্যকেই নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন না? যদি না পারেন, যে গুপ্ত বংশ কয়েকশত বৎসর প্রবলপ্রতাপে ভারত শাসন করিতেছেন, তাঁহাদেরই বংশধরদের নূতন এই থানেশ্বররাজের সাম্রাজ্যে অধীন সামন্ত রাজা মাত্র হইয়া থাকিতে হইবে।

কথাটা মালবরাজের মনে হইতেছিল। দূর বাঙ্গালার শশাঙ্কেরও

মনে হইতেছিল। কিন্তু তিনি তখন কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ম্মার সঙ্গে যুদ্ধে বড় ব্যস্ত ছিলেন ভাবিয়াছিলেন, এই যুদ্ধের একটা কিনারা কিছু হইলেই দেবগুপ্তের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিবেন।

কিন্তু দেবগুপ্তের পক্ষে বেশী দিন অপেক্ষা করা সম্ভব হইল না। প্রভাকরবর্দ্ধনের রাজ্যের সীমা মালব পর্য্যন্ত আসিয়াছে। একবার মালবীদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। মালবীরা সে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে এবং গুপ্ত বংশের দুইজন রাজপুত্রকে প্রভাকরবর্দ্ধন সঙ্গে লইয়া গিয়া নিজের পুত্রদের সহচর করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার পর একেবারে মালব অধিকার করিতেই চেষ্টা করিবেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যকে আবার গড়িয়া তোলা দূরে থাক্, একা দেবগুপ্তের পক্ষে মালব রক্ষা করাই কঠিন হইবে। গুপ্তরাজকুলের শ্রেষ্ঠ বীর এখন বাঙ্গালার শশাঙ্ক। ইঁহার সঙ্গে যদি তিনি মিলিত হইতে পারেন, তবে মালবরক্ষা ত হইবেই, গুপ্ত সম্রাট্‌দের রাজপতাকাও আবার হয়ত উত্তরভারত ভরিয়া উড়িবে। শশাঙ্কের নিকটে তিনি এক দূত পাঠাইলেন।

(২)

ভাস্করবর্ম্মাকে এক যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া শশাঙ্ক কেবলমাত্র রাজধানী কর্ণসুবর্ণে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এমন সময় দেবগুপ্তের দূত সুমিত্র আসিয়া পৌঁছিলেন।

আহার বিশ্রামাদির পর রাজপ্রাসাদের নিভৃত একটি ঘরে শশাঙ্ক সুমিত্রকে ডাকাইলেন। সুমিত্র আসিয়া অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "গৌড়েশ্বর মহারাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের জয় হউক!"

শশাঙ্ক কহিলেন, "আসুন! নমস্কার! এই আসনে বসুন। কুশলে আছেন ত?"

আসনে বসিয়া সুমিত্র কহিলেন, "হাঁ, দৈহিক কুশল বটে। মহারাজের মঙ্গল ত ?

"হাঁ, আপাততঃ বটে। আপনি দৈহিক কুশলের কথা বলিলেন। তবে কি মানসিক অশান্তির কোনও কারণ আছে ?"

সুমিত্র উত্তর করিলেন, "প্রভু যার বিপন্ন, মানসিক শান্তি যে তার কিছুই থাকিতে পারে না, একথা সহজেই মহারাজ বুঝিতে পারেন।"

"বিপন্ন ! মহারাজ দেবগুপ্ত কিসে এমন বিপন্ন হইয়াছেন ?"

"মহারাজ কি পশ্চিম ভারতের সংবাদ কিছু শোনেন নাই ?

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "হাঁ, কিছু কিছু শুনিয়াছি বই কি ? তবে নিকটবর্ত্তী এক শত্রুর সঙ্গে নিজে যুদ্ধে বড়ই বিব্রত ছিলাম, তাই তেমন মনোযোগ দিতে পারি নাই।'

সুমিত্র কহিলেন, "মহারাজের নিকটবর্ত্তী শত্রু ? কে সে ? কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা ?"

"হাঁ, তিনিই বটে।"

সুমিত্র কহিলেন, "হাঁ, পাশাপাশি দুইটি রাজ্যের মধ্যে চিরকালই এই শত্রুতা চলে, মিত্রতা বড় দেখা যায় না। তা ছাড়া মহারাজের শাসনে বাঙ্গালার যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, আর শক্তিবল যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে কামরূপ-রাজ্যের ঈর্ষা হইতে পারে। ভয়ও হইবার কথা, পাছে তাঁহার রাজ্য আপনি জয় করিয়া লয়েন।"

"হাঁ, তিনি আমাকে ঈর্ষাও করেন, ভয়ও করেন। তা করুন, আর এইজন্য সামান্য কারণে বাঙ্গালার সীমান্তে যতই অশান্তির সৃষ্টি করুন, আমাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবেন, কি বাঙ্গালা কাড়িয়া লইবেন, এত শক্তি ভাস্করবর্ম্মার নাই।"

সুমিত্র কহিলেন, "ভাস্করবর্ম্মাকে দূর করিয়া আপনিই কামরূপ অধিকার করিয়া লউন না কেন ?"

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "বাঙ্গালাই যথেষ্ট বড় দেশ। কামরূপের মধ্যে তাকে বাড়াইয়া লইবার প্রয়োজন কিছু দেখি না।"

সুমিত্র কহিলেন, "মহারাজ যে গুপ্ত সম্রাট্‌দের বংশধর, সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছেন ?"

একটু হাসিয়া শশাঙ্ক কহিলেন, "না, ভুলি নাই সুমিত্র। গুপ্তসম্রাট্‌দের গৌরব যদি আবার ভারতে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হয়, তখন কে জানে, হয়ত এই বাঙ্গালাই পূর্ব্বে ও পশ্চিমে বাড়িয়া সেই সাম্রাজ্য হইয়া দাঁড়াইবে কি না। হাঁ, দেবগুপ্ত কি প্রয়োজনে আপনাকে পাঠাইয়াছেন ! কি বিপদে তিনি পড়িয়াছেন ?"

সুমিত্র কহিলেন "থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের কথা আপনি শুনিয়াছেন ত ?

"শুনিয়াছি। তিনি নাকি বড় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন। কেন তিনি কি মালব আক্রমণ করিতেছেন ?"

সুমিত্র কহিলেন, "মালবের সীমা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য এখন বিস্তৃত হইয়াছে। একটা যুদ্ধেও মালবীরা পরাজিত হইয়াছে। শীঘ্রই মালব জয় করিতে তিনি চেষ্টা করিবেন। ওদিকে কান্যকুব্জের রাজা গ্রহবর্ম্মা তাঁহার জামাতা এবং একান্ত তাঁহার অনুগত। এই গ্রহবর্ম্মার সাহায্যে যদি মালব জয় করিতে পারেন, তাঁহার রাজ্য তখন কত বড় হইবে বুঝিতে পারিতেছেন ? তারপর তিনি পূবে মগধের দিকে আসিবেন। মগধ আর বাঙ্গালা প্রায় এখন এক রাজ্য। পশ্চাতে ভাস্করবর্ম্মা রহিয়াছেন আপনার বড় শত্রু। আর এ সংবাদ মহারাজ বোধ হয় রাখেন না, যে গোপনে প্রভাকরবর্দ্ধনের পক্ষে ভাস্করবর্ম্মার এমন একটা মিত্রতার

যোগ হইয়াছে। এদিকের সকল যুদ্ধেই ইনি তাঁহার সাহায্য করিবেন।"

"হাঁ, এইরূপ কথা আমার কানেও আসিয়াছে বটে।"

সুমিত্র কহিলেন, "কানে যাহা আসিয়াছে, তাহা সত্য বলিয়াই জানিবেন। প্রভাকরবর্দ্ধনের অভিপ্রায় শীঘ্রই তিনি মালব আক্রমণ করিবেন। আর দেবগুপ্তের কোনও সহায়তায় আপনি না যাইতে পারেন, তাই তাঁহারই পরামর্শমত ভাস্করবর্ম্মা বাঙ্গালা আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিবেন।"

"হাঁ, বুঝিতে পারিতেছি সব।"

সুমিত্র কহিলেন, "যদি মালব জয় করিতে পারেন, ভারতের সাম্রাজ্য প্রভাকরবর্দ্ধনেরই হইবে। গুপ্তবংশের সাম্রাজ্য ত দূরের কথা, আপনার এই বাঙ্গালা রাজ্যটিও স্বাধীন থাকিবে না।"

"হাঁ, ঠিক বলিয়াছেন আপনি! আমাকে এখন তাহা হইলে মালবের দিকেই যাইতে হয়। কিন্তু গেলে এখনই আবার ভাস্করবর্ম্মা বাঙ্গালা আক্রমণ করিবেন।"

সুমিত্র কহিলেন, "আক্রমণ তিনি করিবেনই। বাঙ্গালা রক্ষার ভাল একটা ব্যবস্থা করিয়া আপনাকে যাইতে হইবে। জানিবেন এ বিপদ আপনাদের দুইজনেরই সমান। মালব রক্ষা করিয়া প্রভাকরবর্দ্ধনকে যদি উত্তরে হঠাইয়া দিতে পারেন, তবেই আপনার বাঙ্গালা রক্ষা পাইবে, নতুবা নয়। আর গুপ্তসাম্রাজ্যকে যদি আবার গড়িয়া তুলিতে চান, তাহারও উপায় এই। আমার প্রভু দেবগুপ্ত ইহাও বলিয়াছেন, বঙ্গেশ্বর শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তই গুপ্ত-রাজকুলে এখন শ্রেষ্ঠ শক্তিধর পুরুষ। যদি সে সাম্রাজ্য আবার হয়, বঙ্গেশ্বরই তাহার অধীশ্বর হইবেন।"

হাসিয়া শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত গৌরবের লোভ কিছু দেখাইবার প্রয়োজন নাই, সুমিত্র মহাশয়! দেবগুপ্ত আমার

আত্মীয়। তিনি বিপন্ন হইলে সহায়তা আমাকে করিতেই হইবে। আবার এই বিপদ আজ দুইজনেরই সমান। ভবিষ্যতে যাহা হইবার হইবে, এখন আমাদের একযোগে চেষ্টা করিতে হইবে এই বিপদ হইতে কিসে উদ্ধার পাই।”

একটু লজ্জা পাইয়া সুমিত্র কহিলেন, “ক্ষমা করুন মহারাজ, লোভ দেখাইতে আপনাকে চাই নাই। তবে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের উদ্ধার যদি হয়—”

বাধা দিয়া শশাঙ্ক কহিলেন, “থাক্, আর ও কথায় কাজ নাই, সুমিত্র মহাশয়। গুপ্তসাম্রাজ্যের উদ্ধার হউক, এ কামনা আমিও করি। গুপ্ত রাজবংশধর সকলেই এ কামনা করিবেন। উদ্ধার হইলে তার অধীশ্বর দেবগুপ্ত হউন, কিছু আপত্তি তাহাতে আমার নাই। বলিয়াছি, আমার এই বাঙ্গালাই আমার যথেষ্ট। বাঙ্গালার শক্তিবল আরও বাড়ুক, বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধি হউক, বাঙ্গালা লইয়া আমি সেই গুপ্ত সাম্রাজ্যেরই একজন সহায় ও মিত্র হইব।”

“যে আজ্ঞা। তাহা হইলে এখন আমি বিদায় লইতে পারি। পথ অল্প নয়, যতশীঘ্র মালবে গিয়া পৌছিতে পারি, ততই ভাল।”

“হাঁ, আসুন তবে। দেবগুপ্তকে বলিবেন, বাঙ্গালা রক্ষার একটা সুব্যবস্থা করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব মালবের দিকে আমি যাত্রা করিব।”

সেইদিনই সুমিত্র চলিয়া গেলেন।

(৩)

থানেশ্বরের ওধারে উত্তরপশ্চিম সীমান্তে আবার হুনেরা উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাদের দমন করিবার জন্য প্রভাকরবর্দ্ধন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্দ্ধনকে পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি ফিরিয়া আসিবার আগেই হঠাৎ কোনও কঠিন রোগে প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু হইল। এই সুযোগে

দেবগুপ্ত তাঁহার সেনা লইয়া উত্তরভারতের দিকে অগ্রসর হইলেন। শশাঙ্ক তখনও আসিয়া পৌছেন নাই। কিন্তু তাঁহার জন্য তিনি অপেক্ষা করিলেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কান্যকুব্জের রাজা গ্রহবর্ম্মা প্রভাকর-বর্দ্ধনের জামাতা এবং একজন প্রধান সহায়। বরাবর গিয়া দেবগুপ্ত কান্য-কুব্জ আক্রমণ করিলেন। গ্রহবর্ম্মা যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন; কান্যকুব্জ দেবগুপ্তের হাতে আসিল। প্রভাকরবর্দ্ধনের কন্যা এবং গ্রহবর্ম্মার স্ত্রী রাজ্যশ্রী ছিলেন যারপরনাই বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী নারী। পাছে নগরবাসীদের সাহায্যে তিনি আবার কান্যকুব্জ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন, তাই দেবগুপ্ত তাঁহাকে কারাগারে কড়া পাহারায় রাখিয়া দিলেন।

এ দিকে হূন্‌যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজ্যবর্দ্ধন থানেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। পিতা নাই, তিনিই তখন রাজপাটে বসিলেন। অবিলম্বে ভগিনী রাজ্যশ্রীর এই বিপদের সংবাদ তিনি পাইলেন, এবং তখনই বহু সৈন্য লইয়া কান্যকুব্জের দিকে যাত্রা করিলেন। দেবগুপ্তও তাঁহার সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। পথে একস্থানে দুই পক্ষে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। দেবগুপ্ত পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেলেন। দেবগুপ্তের বহু ধন-রত্ন ও অস্ত্র-শস্ত্র রাজ্যবর্দ্ধনের হাতে পড়িল। ভণ্ডী নামক একজন কর্ম্মচারীর সঙ্গে কতক সৈন্য দিয়া সেই সব তিনি থানেশ্বরে পাঠাইলেন; এবং বাকী সৈন্য লইয়া কান্যকুব্জের দিকে চলিলেন। ঠিক এমন সময় বাঙ্গালী সেনা লইয়া শশাঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কান্যকুব্জের কাছে আবার একটা ভীষণ যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হইলেন।*

* একটি কিম্বদন্তি এই আছে যে শশাঙ্ক বন্ধুভাবে রাজ্যবর্দ্ধনকে আপনার শিবিরে নিমন্ত্রণ করেন; তারপর একা তাঁহাকে অসহায় অবস্থায় পাইয়া হত্যা করেন। ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। অনেক বিখ্যাত ইতিহাস-লেখকও ইহা সত্য বলিয়া মনে করেন না।

ইহার পরেই শশাঙ্ক গিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করিলেন। প্রথমেই তিনি রাজ্যশ্রীকে মুক্ত করিয়া দেন,—তারপর কান্যকুব্জের শাসন ও রক্ষার ব্যবস্থা করিতে থাকেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই একজন কর্ম্মচারীর হাতে কান্যকুব্জের শাসন ও রক্ষার ভার দিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালায় ফিরিতে হয়। কারণ সংবাদ আসিয়াছিল, কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ম্মা বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া রাজধানী, কর্ণস্থবর্ণ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন। ফিরিয়াই তিনি শুনিলেন, ভাস্করবর্ম্মা কর্ণস্থবর্ণ দখল করিয়াই বসিয়াছেন। বরাবর তিনি রাজধানীর দিকে গেলেন। অধিকার করিয়াছেন, সহজে ছাড়িবেন কেন? ভাস্করবর্ম্মাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অনেক দিন যুদ্ধের পর শশাঙ্ক শেষে তাঁহাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

(৪)

রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু সংবাদ থানেশ্বরে আসিল। কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধন তখন রাজা হইলেন। তরুণরাজা মহাবীর রাজ্যবর্দ্ধনের অকাল মৃত্যুতে সকলেই বড় ক্ষুব্ধ হইল। হর্ষবর্দ্ধন প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইহার প্রতিশোধ যতদিন না লইতে পারেন, শশাঙ্কের প্রাণনাশ করিয়া বাঙ্গালা যতদিন না জয় করিতে পারেন, ততদিন ডান হাতে তুলিয়া কোনও খাবার তিনি খাইবেন না!

তখনই থানেশ্বরের সেনা সব সাজিল; হর্ষবর্দ্ধন গিয়া কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন। শশাঙ্ক যে কর্ম্মচারী ও সৈন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের সাধ্য ছিল না ইহাদের আক্রমণে বাধা দিতে পারে। কান্যকুব্জ হর্ষবর্দ্ধনের হাতে পড়িল। মুক্তি পাইবার পর রাজ্যশ্রী মনের দুঃখে এক পাহাড়-

কারণ একা এইরূপ অসহায় অবস্থায় রাজ্যবর্দ্ধন তাঁহার শত্রুর শিবিরে গিয়াছিলেন, ইহা একেবারেই সম্ভব নয়। রাজ্যবর্দ্ধনের পক্ষের লোকেরা বিদ্বেষবশতঃ শশাঙ্কের নামে মিথ্যা এই অপবাদ প্রচার করেন এইরূপ ঐতিহাসিকগণের ধারণা।

জঙ্গল অঞ্চলে চলিয়া যান। হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিলেন। তিনি বিধবা, পুত্রহীনা। কান্যকুব্জের রাজ্যভার ভাই হর্ষবর্দ্ধনের হাতে ছাড়িয়া দিলেন এবং নিজে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইলেন। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধন বোনকে বড় ভাল বাসিতেন; রাজপুরী ছাড়িয়া তাঁহাকে কোথাও যাইতে দিলেন না,—কহিলেন,—"থানেশ্বর আর কান্যকুব্জ একরাজ্য হউক। কান্যকুব্জ নগরই এখন হইতে তাঁহার রাজধানী হইবে। তুমি বিধবা, পুত্রহীনা; তুমি সন্ন্যাসিনী হইয়াছ। ভারতের সকল বিধবাই ত প্রকারান্তরে সন্ন্যাসিনী। রাজপুরীতেই থাক, রাজ্য শাসনে আমার সহায় হও। মনে করিও, এই রাজ্য তোমার আমার দুইজনেরই। তুমি বুদ্ধিমতী, বিদ্যাশিক্ষাও অনেক করিয়াছ। তোমার সহায়তা পাইলে রাজ্যের শক্তি অনেক বাড়িবে। তুমি বৌদ্ধ; আজ হইতে আমিও বৌদ্ধ হইলাম। মহারাজ অশোকের মত আমরা দুইজনে আবার ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মকে বড় করিয়া তুলিব।"

ভ্রাতার এই কথায় রাজ্যশ্রী আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন,—রাজ্য-শাসনে ভ্রাতার বড় একজন সহায় হইয়া রাজপুরীতে রহিলেন। শোনা যায় ভাই বোন দুইজনে রাজসভায় এক আসনে বসিয়া রাজ্যের কাজ সব করিতেন।

(৫)

দেবগুপ্ত কোথায় গিয়াছেন, কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। নিজে ভাস্করবর্ম্মার সঙ্গে যুদ্ধে অত্যন্ত বিব্রত। তাই শশাঙ্ক এদিকে মনোযোগও কিছু দিতে পারিলেন না।

মালব থানেশ্বর আর কান্যকুব্জ তিনটি রাজ্য এক হওয়ায়, হর্ষবর্দ্ধন এখন উত্তর-ভারতের প্রধান রাজা হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে

ইহার পরেই শশাঙ্ক গিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করিলেন। প্রথমেই তিনি রাজ্যশ্রীকে মুক্ত করিয়া দেন,—তারপর কান্যকুব্জের শাসন ও রক্ষার ব্যবস্থা করিতে থাকেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই একজন কর্ম্মচারীর হাতে কান্যকুব্জের শাসন ও রক্ষার ভার দিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালায় ফিরিতে হয়। কারণ সংবাদ আসিয়াছিল, কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ম্মা বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া রাজধানী, কর্ণস্থবর্ণ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন! ফিরিয়াই তিনি শুনিলেন, ভাস্করবর্ম্মা কর্ণস্থবর্ণ দখল করিয়াই বসিয়াছেন। বরাবর তিনি রাজধানীর দিকে গেলেন। অধিকার করিয়াছেন, সহজে ছাড়িবেন কেন? ভাস্করবর্ম্মাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অনেক দিন যুদ্ধের পর শশাঙ্ক শেষে তাঁহাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

(8)

রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু সংবাদ থানেশ্বরে আসিল। কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধন তখন রাজা হইলেন। তরুণরাজা মহাবীর রাজ্যবর্দ্ধনের অকাল মৃত্যুতে সকলেই বড় ক্ষুব্ধ হইল। হর্ষবর্দ্ধন প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইহার প্রতিশোধ যতদিন না লইতে পারেন, শশাঙ্কের প্রাণনাশ করিয়া বাঙ্গালা যতদিন না জয় করিতে পারেন, ততদিন ডান হাতে তুলিয়া কোনও খাবার তিনি খাইবেন না!

তখনই থানেশ্বরের সেনা সব সাজিল; হর্ষবর্দ্ধন গিয়া কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন। শশাঙ্ক যে কর্ম্মচারী ও সৈন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের সাধ্য ছিল না ইহাদের আক্রমণে বাধা দিতে পারে। কান্যকুব্জ হর্ষবর্দ্ধনের হাতে পড়িল। মুক্তি পাইবার পর রাজ্যশ্রী মনের দুঃখে এক পাহাড়-

কারণ একা এইরূপ অসহায় অবস্থায় রাজ্যবর্দ্ধন তাঁহার শত্রুর শিবিরে গিয়াছিলেন, ইহা একেবারেই সম্ভব নয়। রাজ্যবর্দ্ধনের পক্ষের লোকেরা বিদ্বেষবশতঃ শশাঙ্কের নামে মিথ্যা এই অপবাদ প্রচার করেন এইরূপ ঐতিহাসিকগণের ধারণা।

জঙ্গল অঞ্চলে চলিয়া যান। হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিলেন। তিনি বিধবা, পুত্রহীনা। কান্যকুব্জের রাজ্যভার ভাই হর্ষবর্দ্ধনের হাতে ছাড়িয়া দিলেন এবং নিজে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইলেন। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধন বোনকে বড় ভাল বাসিতেন; রাজপুরী ছাড়িয়া তাঁহাকে কোথাও যাইতে দিলেন না,—কহিলেন,—"থানেশ্বর আর কান্যকুব্জ একরাজ্য হউক। কান্যকুব্জ নগরই এখন হইতে তাঁহার রাজধানী হইবে। তুমি বিধবা, পুত্রহীনা; তুমি সন্ন্যাসিনী হইয়াছ। ভারতের সকল বিধবাই ত প্রকারান্তরে সন্ন্যাসিনী। রাজপুরীতেই থাক, রাজ্য শাসনে আমার সহায় হও। মনে করিও, এই রাজ্য তোমার আমার দুইজনেরই। তুমি বুদ্ধিমতী, বিদ্যাশিক্ষাও অনেক করিয়াছ। তোমার সহায়তা পাইলে রাজ্যের শক্তি অনেক বাড়িবে। তুমি বৌদ্ধ; আজ হইতে আমিও বৌদ্ধ হইলাম। মহারাজ অশোকের মত আমরা দুইজনে আবার ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মকে বড় করিয়া তুলিব।"

ভ্রাতার এই কথায় রাজ্যশ্রী আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন,—রাজ্য-শাসনে ভ্রাতার বড় একজন সহায় হইয়া রাজপুরীতে রহিলেন। শোনা যায় ভাই বোন দুইজনে রাজসভায় এক আসনে বসিয়া রাজ্যের কাজ সব করিতেন।

(৫)

দেবগুপ্ত কোথায় গিয়াছেন, কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। নিজে ভাস্করবর্ম্মার সঙ্গে যুদ্ধে অত্যন্ত বিব্রত। তাই শশাঙ্ক এদিকে মনোযোগও কিছু দিতে পারিলেন না।

মালব থানেশ্বর আর কান্যকুব্জ তিনটি রাজ্য এক হওয়ায়, হর্ষবর্দ্ধন এখন উত্তর-ভারতের প্রধান রাজা হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে

আরও অনেক রাজ্য তাঁহার অধিকারে আসিল। হর্ষবর্দ্ধনই উত্তর ভারতের চক্রবর্ত্তী বা সম্রাট্ হইলেন ।

বুদ্ধদেব মগধ বা বিহার অঞ্চলেই তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। তারপর মগধের রাজারাই ভারতসম্রাট্ হন, এবং মৌর্য্যবংশীয় মহারাজ অশোক বৌদ্ধ হইয়া ভারতে আর ভারতের বাহিরেও নানাদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করেন। সুতরাং মগধ অঞ্চলই বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায় এবং এই অঞ্চলের প্রায় সকল লোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। গুপ্তরাজারা হিন্দু ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ প্রজাদের জোর করিয়া হিন্দু করিবার চেষ্টা করেন নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতবর্ষের রাজারা প্রজার উপরে জোর জুলুম কখনও করিতেন না। তখন হিন্দু বৌদ্ধ আর জৈন এই তিন ধর্ম্মের লোকই দেশে ছিল। রাজা যখন যে ধর্ম্মেরই লোক হউন, প্রজারা যে যেমন ভাল মনে করিত, সে সেই ধর্ম্মই মানিয়া চলিত। গুপ্তরাজাদের সময়ে কতক কতক লোক হিন্দু হইলেও মগধের বেশীর ভাগ লোকই বৌদ্ধ ছিল। মগধের অনেক অংশই এখন শশাঙ্কের অধীন এবং শশাঙ্ক নিজে শিব-ভক্ত হিন্দু। কিন্তু বৌদ্ধ প্রজারা স্বচ্ছন্দে তাহাদের ধর্ম্ম মানিয়া চলিত। কখনও কোনও বাধা শশাঙ্ক তাহাতে দিতেন না। জোর করিয়াও তাহাদের হিন্দু করিতে চাহিতেন না।

তবে নিজেদের ধর্ম্ম যাহা, সেই ধর্ম্মের রাজা পাইলে সকল প্রজাই বড় আনন্দিত হয়। মনে করে, তাহাদের ধর্ম্মের শক্তি ও গৌরব ইহাতে বাড়িবে ; ধর্ম্মের সহায়তাও রাজা করিবেন। অনেক দিন ভারতবর্ষে বড় কোথাও বৌদ্ধ রাজা ছিলেন না। অত বড় একজন রাজা হর্ষবর্দ্ধন যখন বৌদ্ধ হইলেন, মগধের বৌদ্ধ প্রজারা বড় আনন্দিত হইল এবং তাঁহারই পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। ইহাও সকলে জানিত, হর্ষবর্দ্ধন শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের বড় একজন শত্রু এবং তাঁহাকে ধ্বংস করিতে চান। শত্রুতার কারণও

কাহারও অজানা ছিল না। এ অবস্থায় ইহাই স্বাভাবিক যে মগধের এই বৌদ্ধ প্রজারা সুযোগ পাইলেই শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্দ্ধনের সহায়তা করিবে। সে চেষ্টাও তাহারা সর্ব্বদা করিত। ইহাদিগকে এইজন্য কড়া শাসনে রাখিতে হইত; কিছু কিছু অত্যাচারও সময়ে সময়ে তাহাতে হয়। কিন্তু কোনও উপায় ইহার ছিল না।

ওদিকে বার বার পরাজয়ের পর কামরূপরাজ এখন স্পষ্টভাবেই হর্ষবর্দ্ধনের বড় একজন মিত্র ও সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। নিজে বৌদ্ধ হইলেন এবং সম্রাট্ বলিয়া হর্ষবর্দ্ধনের প্রাধান্য মানিয়া লইলেন।

একদিকে ভাস্করবর্ম্মা, অপরদিকে মগধের বৌদ্ধ প্রজাগণ, উভয় পক্ষই তাঁহার পরম শত্রু, হর্ষবর্দ্ধনের অনুগত। শশাঙ্ক বড় সঙ্কটে পড়িলেন। ভারত-সাম্রাজ্যের আশা ত আগেই গিয়াছে, নিজের বাঙ্গালা রক্ষা করাই তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু শশাঙ্ক দমিলেন না,—দমিবার পাত্রই তিনি ছিলেন না। কখনও ভাস্করবর্ম্মার সঙ্গে যুদ্ধে, কখনও বৌদ্ধ প্রজাদের বিপক্ষতায়, সর্ব্বদাই তাঁহাকে বড়ই বিব্রত থাকিতে হইত।—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাঙ্গালী প্রজারা তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিত, তাঁহার জন্য যথাসর্ব্বস্ব—প্রাণ পর্য্যন্ত—সমর্পণ করিতেও তাহারা প্রস্তুত ছিল, এবং ইহাদের এই বল লইয়া শশাঙ্কও সর্ব্বদা এইজন্য সতর্ক থাকিতেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর ১৫।১৬ বৎসর মধ্যে অত বড় শক্তিশালী রাজা হইয়াও হর্ষবর্দ্ধন বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই।

কিন্তু ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা ভোলেন নাই। শেষে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করিবার আয়োজন করিলেন। ভাস্করবর্ম্মার কাছেও এই সংবাদ গেল, যে তিনি যেন ঠিক সময়ে তাঁহার সকল সৈন্যবল লইয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করেন।

বৌদ্ধেরাও দল বাঁধিয়া প্রায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বিহার-অঞ্চলে বৌদ্ধদের অনেক মঠ ও তীর্থ ছিল। এই সব মঠে আর তীর্থে সকলে গিয়া একত্র হইত, এবং বিদ্রোহের পরামর্শ ও আয়োজন করিত। শশাঙ্কের একজন সেনাপতি ছিলেন বিক্রমসেন,—শাসনে রাখিবার জন্য ইঁহাকে শশাঙ্ক বিহারে পাঠান। বৌদ্ধেরা এইরূপ চক্রান্ত করিতেছে, তাই তাহাদের দমন করিবার জন্য কোনও কোনও মঠে ও তীর্থস্থানে বিক্রমসেন সেনা লইয়া যান এবং নানা রকম অত্যাচারও তাহাতে হয়।

সংবাদ পাইয়া শশাঙ্ক বিহারে চলিয়া আসিলেন। অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, কেবল বিরুদ্ধ বৌদ্ধ প্রজাদের উপরে নয়, সন্ন্যাসীদের উপরে এবং বৌদ্ধ তীর্থগুলির উপরেও অত্যাচার কিছু কিছু হইয়াছে।

শশাঙ্ক কহিলেন, "এ কি করিতেছ বিক্রমসেন? ইহারা আমার প্রজা। বিদ্রোহী হইলে দমন অবশ্য করিতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের ধর্ম্মের সঙ্গে বিরোধ করিবে? ইহাদের মঠ, ইহাদের তীর্থ, এসব কেন লণ্ডভণ্ড করিতেছ?"

বিক্রমসেন উত্তর করিলেন, "কি করিব মহারাজ? এই সব মঠ আর তীর্থই হইয়াছে এই সব চক্রান্তে ইহাদের মিলনের স্থান। সৈন্য লইয়া এই স্থানে আসিলে কিছু লণ্ডভণ্ড হইবেই। এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে দেখিলাম, তাহাতে ইহাদের একেবারে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিতে হইবে, না হয় হর্ষবর্দ্ধনের হাতে এই অঞ্চল ছাড়িয়া দিয়া আমাদের বাঙ্গালায় সরিয়া যাইতে হইবে।"

শশাঙ্ক কহিলেন, "বহুপুরুষ এদেশের অধিবাসী ইহারা, ধর্ম্মও ইহাদের বহুকালের। না, একেবারে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিতে পারি না। রাজা হইলেও সে অধিকার আমার নাই।"

বিক্রমসেন কহিলেন, "হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার সেনা লইয়া আসিলে ইহারা একযোগে সকলে অস্ত্র ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিবে।"

"সে বিষয়ে সন্দেহ কিছু নাই।"

বিক্রমসেন কহিলেন, "সুতরাং হর্ষবর্দ্ধন আসিবার আগেই ইহাদের একেবারে নিম্মূল করিয়া দেশ হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। আর তা যদি না করিতে চান, তবে ইহাদের হাতেই এদেশ একেবারে ছাড়িয়া দিন। সব সেনা লইয়া, শাসনপাট তুলিয়া, চলুন বাঙ্গালার ভিতরে আমরা চলিয়া যাই! কে জানে, হয়ত হর্ষবর্দ্ধন এই মগধ পাইয়াই নিরস্ত থাকিবেন।"

"না, তা থাকিবেন না! বরং আমাদের দুর্ব্বল ও অক্ষম মনে করিয়া তাড়াতাড়িই গিয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করিবেন। ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ তিনি হইতে চান। এত বড় বাঙ্গালা স্বাধীন থাকিলে, তা হইতে পারেন না। সুতরাং বাঙ্গালা জয় করিতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। তা ছাড়া, তাঁহার ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য আমাকেও ধ্বংস করিবেন, এই প্রতিজ্ঞা তিনি করিয়াছেন।"

"রাজ্যবর্দ্ধন ত যুদ্ধে মারা গিয়াছেন!"

শশাঙ্ক কহিলেন, "কিন্তু লোকে রটাইয়াছে, আমি তাঁহাকে বন্ধুভাবে নিজের শিবিরে ডাকিয়া আনিয়া হত্যা করিয়াছি। তাঁহার সভাপণ্ডিত মহাকবি বাণভট্ট একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যেও এই কথা আছে। আরও আমাকে বলিয়াছেন, গৌড়ভুজঙ্গ। এই কলঙ্ক চিরকাল এই ভারতে আমার থাকিবে। আবার তুমি যে এই অত্যাচারগুলি এখন করিলে, তাহাও আমার নামে আর একটা বড় কলঙ্ক হইবে। চিরকাল হয়ত লোকে এদেশে বলিবে, বাঙ্গালার রাজা শশাঙ্ক আততায়ী,

বিশ্বাসঘাতী ; শশাঙ্ক অত্যাচারী, নিরীহ বৌদ্ধদের পীড়ক। তবু যদি বাঙ্গালা রক্ষা করিতে পারিতাম, কোনও দুঃখ থাকিত না।"

বিক্রমসেন কহিলেন, "বাঙ্গালা রক্ষা করিতে পারিবেন না ? আপনার ভক্ত বাঙ্গালী বীর আমাদের দেহে রক্তবিন্দু থাকিতে হর্ষবর্দ্ধন বাঙ্গালা জয় করিতে পারিবে না !"

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "না, রক্তবিন্দু তোমাদের দেহে থাকিতে পারিবে না। কিন্তু সব রক্ত পাত হইয়া গেলে, পারিবে। আমি মরিব, তোমরা মরিবে, কিন্তু বাঙ্গালা হর্ষবর্দ্ধনের অধীন হইবে। যাক্, ওসব ভাবিবার এখন সময় নাই। প্রাণপণ করিয়া দেখিব, শেষে মহাদেবের মনে যা আছে হইবে।"

"এখন তবে কি আদেশ করেন ?"

"মগধ ছাড়িয়া যাইব না। তাহাতে দুর্ব্বল ও ভীরু বলিয়া আমাদের বড় নিন্দা হইবে। তা'ছাড়া, বিনা বাধায় সকলে হর্ষবর্দ্ধনের সহায় হইয়া দাঁড়াইবে। মঠে কি তীর্থে অত্যাচার কিছু করিও না। বাহিরে যতদূর পার বিদ্রোহী প্রজাদের দমন রাখিবার চেষ্টা করিবে। আমি যাই। সৈন্য লইয়া এদিকে আসি। কতক আবার পূবেও পাঠাইতে হইবে। কারণ ভাস্করবর্ম্মাও সাজিতেছে, হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা আক্রমণ করিবে।"

অল্পদিনের মধ্যে হর্ষবর্দ্ধন বিশাল সেনা লইয়া মগধের দিকে আসিলেন। ওদিকে ভাস্করবর্ম্মাও বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন।

অনেকদিন ধরিয়া অবিরত ভীষণ যুদ্ধ চলিল। বহু বৎসর যাবৎ অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করিয়া শশাঙ্কের শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এই যুদ্ধের মধ্যেই কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া রণশিবিরেই শশাঙ্ক দেহত্যাগ করিলেন। কেহ কেহ বলেন, এই যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁহার এক পিতৃব্যপুত্র মাধবগুপ্ত বাঙ্গালার রাজা হইলেন। যুদ্ধে জয়লাভ কোনও মতেই আর সম্ভব নয় বুঝিয়া ইনি হর্ষবর্দ্ধনের অধীনতা স্বীকার করেন।

যশোভাস্কর শশাঙ্কের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গেই এই যুগের গৌরবভাতি একেবারে নিভিয়া গেল; বাঙ্গালা আঁধার হইল।

ধর্ম্মপাল

এখন খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দী চলিতেছে। প্রায় তেরশত বৎসর পূর্ব্বে সপ্তম শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে মহারাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়। কয়েক বৎসর পরে সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনেরও মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল। সামন্ত রাজারা সব স্বাধীন হইলেন এবং নিজেরা যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে লাগিলেন। আরও প্রায় এক শত বৎসর এই ভাবে চলিয়া গেল। তখন যশোবর্ম্মা নামে কান্যকুব্জের এক রাজা বাঙ্গালা মগধের সীমা পর্য্যন্ত উত্তরভারতের রাজ্যগুলি সব জয় করিয়া প্রায় একজন সম্রাটের মতই বড় হইয়া উঠিলেন।

ইঁহার এই সাম্রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিমের দিকে—এখনকার রাজপুতনা আর গুজরাট ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলে—প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূট নামে দুইটি ক্ষত্রিয় জাতি বড় প্রবল হইয়া উঠেন। প্রতীহারেরা গুর্জ্জর (গুজরাট) ও রাজপুতনা অঞ্চলে আর রাষ্ট্রকূটরা তার কিছু পূব-দক্ষিণে রাজত্ব করিতেন। গুর্জ্জর অঞ্চলে বাস করিতেন বলিয়া প্রতীহারদের কখনও গুর্জ্জর-প্রতীহার কখনও বা শুধুই গুর্জ্জর বলিত। গুর্জ্জর প্রতীহারদের বড় এক

রাজা তখন ছিলেন বৎসরাজ এবং রাষ্ট্রকূটদের বড় রাজা ছিলেন ধ্রুবধারাবর্ষ। এই দুইটি রাজ্যের পূবের দিকে অবন্তি বা মালব রাজ্যও বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছিল। তখনকার একজন কবি এই চারিটি রাজ্যের রাজা-দিগকে যথাক্রমে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ আর পূব এই চারিটি দিকের দিক্‌পাল নাম দিয়াছেন। কান্যকুব্জের রাজা উত্তরদিক্‌পাল, গুর্জ্জরের রাজা পশ্চিম দিক্‌পাল, রাষ্ট্রকূটরাজ দক্ষিণ দিক্‌পাল, আর অবন্তির রাজা পূর্ব্ব দিক্‌পাল।

মহারাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার এক পিতৃব্যপুত্র মাধবগুপ্ত রাজা হন। হর্ষবর্দ্ধনের অধীনতা স্বীকার করিলেও বাঙ্গালা দেশ তিনিই শাসন করিতেন এবং বাঙ্গালীরা ইঁহাকেই রাজা বলিয়া মানিত। ইঁহার প্রপৌত্র দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত এই সময়ে ছিলেন বাঙ্গালার রাজা। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর এরূপ রাজা আর কেহ রহিলেন না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সামন্ত রাজা যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাই স্বাধীন রাজা হইয়া বসিলেন। কোনও দেশে এই রকম অনেক রাজা হইয়া পড়িলে, সে দেশ বড় দুর্ব্বল হইয়া যায়। রাজারা পরস্পরকে ঈর্ষা করেন এবং কোনও বিপদেও এক মতে মিলিয়া কাজ করিতে পারেন না। বড় একজন নায়কের অভাবে দেশের লোকও সব এক সঙ্গে মিলিতে পারে না।

বাঙ্গালারও ঠিক সেই দশা হইল। পশ্চিম-ভারতের রাজারা তখন আপন আপন রাজ্য বাড়াইয়া পরস্পরকে প্রাধান্যে অতিক্রম করিবার জন্য সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ করিতেছিলেন। বাঙ্গালাকে দুর্ব্বল দেখিয়া ঐ সব রাজারা সুযোগ পাইলেই আসিয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করিতেন। বাঙ্গালার সব ছোট ছোট রাজাদের পরাজিত করিয়া বহু ধন-রত্ন লইয়া যাইতেন। বৎসরাজ একবার বহু সৈন্য লইয়া আসিয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবধারাবর্ষ ছিলেন তাঁহার বড় একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি আসিয়া বাদী হইয়া দাঁড়াইলেন। বৎসরাজ যুদ্ধে হারিয়া পলাইয়া

গেলেন। বাঙ্গালা রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু এই দুইটি পরাক্রান্ত রাজার মারামারি কাটাকাটিতে পশ্চিমভাগ একবারে ছারখার হইয়া গেল।

বাঙ্গালার পূবে কামরূপের রাজা তখন ছিলেন হর্ষদেব। তিনিও বারবার বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, এবং এক সময়ে বাঙ্গালার উত্তরভাগ একেবারে অধিকার করিয়াও ফেলেন।

বাঙ্গালীরা তখন দেখিলেন, বড় একজন রাজা কেহ দেশের ভার না লইলে আর রক্ষা নাই। এই যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহাতে একেবারে উৎসন্ন হইয়া যাইবে।

কিন্তু কে এই ভার লইতে পারেন? গোপাল নামে একজন রাজা ছিলেন। দেখা গেল কি শক্রদের সঙ্গে যুদ্ধে কি নিজের প্রজাদের সুশাসনে তাঁহার ন্যায় যোগ্যতা আর কাহারও নাই। প্রধান প্রধান প্রজারা একদিন একস্থানে একত্র হইলেন ; স্থির হইল এই গোপালকেই বাঙ্গালার রাজা করিতে হইবে।

গোপালের কাছে গিয়া ইঁহারা কহিলেন, "মহারাজ! আমরা আসিয়াছি। রাজা হইয়া বাঙ্গালাকে আপনি রক্ষা করুন এই আমাদের প্রার্থনা।"

গোপাল কহিলেন, "হাঁ, বাঙ্গালার দুর্গতি দেখিতেছি। সব বাঙ্গালী একজন নায়ককে মানিয়া এক হইয়া না দাঁড়াইলে বাঙ্গালা শ্মশান হইবে, বাঙ্গালী জাতিই ভারতে থাকিবে না।"

প্রজারা কহিলেন, "সে নায়ক এক আপনিই হইতে পারেন, তাই আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনি বলুন, আপনাকেই আমরা বাঙ্গালার রাজা বলিয়া ঘোষণা করি।"

গোপাল কহিলেন, "আমার সহায়তা করিতে প্রাণপণে সকলে প্রস্তুত আছেন?"

"হাঁ আছি।"

"ভাল, বাঙ্গালার রাজ্যভার তবে আমি গ্রহণ করিলাম।"

সকলের মুখে তখন আনন্দের ধ্বনি উঠিল,—"জয় মহারাজ গোপাল-দেবের জয়! জয় মহারাজ গৌড়েশ্বরের জয়! জয় মহারাজ বঙ্গেশ্বরের জয়! জয় গৌড়বঙ্গের জয়! জয় বাঙ্গালার জয়!"

এই ঘোষণা সর্ব্বত্র প্রচার করা হইল, মহামহিম শ্রীশ্রীগোপালদেব গৌড়-বঙ্গের শাসন ও রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। প্রজারা সকলে আনন্দে গোপালদেবের জয় জয়কার করিল। ছোট ছোট সব রাজাদের পক্ষেও দেশের এই অশান্তির অবস্থা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারাও সন্তুষ্টচিত্তে গোপালদেবকে আপনাদের প্রধান রাজা বলিয়া মানিয়া লইলেন।

রাজা নিজে শক্তিশালী; প্রজারাও সকলে সহায়। দেশের অশান্তি উপদ্রব সব দূর হইল। এক রাজার এক নিয়মের শাসনে সমস্ত বাঙ্গালা আর বাঙ্গালী জাতি আবার ভারতে বড় হইয়া উঠিল। বিদেশী রাজারা বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে আর ভরসা পাইতেন না, বরং বাঙ্গালাকে কিছু ভয়ই করিয়া চলিতেন।

ভদ্র নামে কোনও রাজার কন্যা দেদ্দদেবীকে গোপাল বিবাহ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্ম্মপাল এই দেদ্দদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। আর একটি পুত্র ছিলেন বাক্‌পাল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে কি নবম শতাব্দীর একেবারে প্রথম ভাগে গোপালের মৃত্যু হয়। তখন ধর্ম্মপাল রাজা হইলেন। গোপালের পিতার নাম ছিল বপ্যট আর পিতামহের নাম ছিল দয়িতবিষ্ণু। কিন্তু গোপালের পর তাঁহার বংশের যত রাজা আর রাজপুত্র, সকলেরই নামের শেষে 'পাল' কথাটি থাকিত। তাই এই বংশেরই নাম হয় পালবংশ।

তোমরা পড়িয়াছ, শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের সময় মগধ বা বিহার ছিল গৌড়বঙ্গ বা বাঙ্গালা রাজ্যেরই একটা ভাগের মত। গোপালদেব আবার

এই মগধ বা বিহারকে বাঙ্গালা রাজ্যের মধ্যে আনিলেন। পালবংশের রাজত্বের প্রারম্ভেই বাঙ্গালা রাজ্য আবার শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের মতই হইয়া উঠিল।

(২)

মধ্যপশ্চিম ভারতে চারজন দিক্‌পাল রাজার কথা তোমাদের বলিয়াছি। ধর্ম্মপালের সময় গুর্জ্জরের রাজা ছিলেন বৎসরাজের পুত্র নাগভট, আর রাষ্ট্রকূটদের রাজা ছিলেন ধ্রুবধারাবর্ষের পুত্র গোবিন্দ। কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মার তখন মৃত্যু হইয়াছে। তিনি উত্তরভারতে যে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মধ্যে বড় বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ইন্দ্রায়ুধ আর চক্রায়ুধ নামে রাজবংশের প্রধান দুই ব্যক্তি সিংহাসন দাবী করিলেন। অবন্তির রাজা ইন্দ্রায়ুধের পক্ষে দাঁড়াইলেন। রাজপুতনা ও পঞ্জাবসিন্ধু অঞ্চলে ভোজ, মৎস্য, যদু, কুরু, কীর, যবন ও গান্ধার নামে আরও কতকগুলি ছোট রাজ্য ছিল। এইসব রাজারাও সকলে ইন্দ্রায়ুধের বাধ্য হইলেন। সকলের সাহায্যে চক্রায়ুধকে দূর করিয়া দিয়া ইন্দ্রায়ুধই কান্যকুব্জের উত্তরদিক্‌পাল রাজা হইলেন। লোকে মনে করিল, কান্যকুব্জের রাজাই আবার আর্য্যাবর্ত্তের বা উত্তর-ভারতের সম্রাট্‌ হইবেন। তবে পূর্ব্বে রহিয়াছেন বাঙ্গালামগধের মহাবীর রাজা ধর্ম্মপাল। আবার দক্ষিণপশ্চিমে গুর্জ্জর-রাজপুতনার নাগভটও বড প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। রাজপুতানা ও পঞ্জাবসিন্ধু অঞ্চলের মৎস্য, ভোজ, যদু, কুরু প্রভৃতি বংশের রাজারাও গুর্জ্জর প্রতীহারদের সজাতীয় কেবল বংশ পৃথক্‌। ইঁহাদিগকে যদি নাগভট নিজের পক্ষে আনিতে পারেন, তবে তাঁহারই সম্রাট্‌ হইবার সম্ভাবনা বেশী। ধর্ম্মপালের তখন মনে হইল, তিনি যদি চক্রায়ুধের পক্ষে দাঁড়ান, আর ইন্দ্রায়ুধের সঙ্গে তাঁহার

মিত্র অবন্তি, ভোজ, মৎস্য প্রভৃতি রাজ্যের রাজাদের পরাজিত করিয়া চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে বসাইতে পারেন, তবে এই সাম্রাজ্য তাঁহারই হাতে আসিবে। নাগভট সহজে তখন আর তাঁহাকে হঠাইতে পারিবেন না।

কিন্তু চক্রায়ুধ এখন কোথায় আছেন ?

ধর্ম্মপালের ছোটভাই বাক্‌পাল মগধে গিয়াছিলেন ; এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। সংবাদ পাইয়াই ধর্ম্মপাল তাঁহাকে ডাকিলেন। বাক্‌পাল আসিয়া ভাইকে অভিবাদন করিলেন। ধর্ম্মপাল কহিলেন, "মঙ্গল হউক ! মগধের সংবাদ সব ভাল ?"

"হাঁ মহারাজ, মগধের সংবাদ ভালই।"

"কান্যকুব্জের চক্রায়ুধ এখন কোথায় আছেন খবর কিছু জান, বাক্‌পাল ?"

"আপনার দ্বারেই তিনি অপেক্ষা করিতেছেন ; দর্শন প্রার্থনা করেন।"

অতি বিস্ময়ে ধর্ম্মপাল ভাইএর মুখপানে চাহিলেন। কহিলেন, "আমার দ্বারে চক্রায়ুধ ! কোথা হইতে আসিলেন ?'

"আপাততঃ মগধ হইতে।"

"মগধ হইতে তোমারই সঙ্গে তবে ?"

"হাঁ মহারাজ ! মগধের সীমান্তে তিনি ছিলেন ; সংবাদ পাইয়াই আমি গিয়া সাক্ষাৎ করি।"

"তারপর ?"

"মহারাজের হয়ত তাঁহাকে প্রয়োজন হইতে পারে। তাই অভয় দিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি।"

"উত্তম করিয়াছ ! আমার মনের কথাটা তাহা হইলে তুমি বুঝিয়াছ দেখিতেছি।"

বাক্‌পাল কহিলেন, "উত্তর ভারতে যে বিপ্লব সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কোন্ কথাটা আপনার মনে হইবে তাহাই যদি না বুঝিতে পারিব, বৃথাই মহারাজের ভাই হইয়া জন্মিয়াছিলাম।"

ধর্ম্মপাল কহিলেন, "তোমার মত ভাই যার, সে না করিতে পারে কি? গোপালবংশের গৌরব তুমি!"

বাক্‌পাল উত্তর করিলেন, "গোপালবংশের গৌরব গৌড়বঙ্গ-মগধের অধীশ্বর মহারাজ ধর্ম্মপাল। বাক্‌পাল তাঁহার অনুগত দাস মাত্র।"

হাসিয়া ধর্ম্মপাল কহিলেন, "তোমারই উপযুক্ত কথা বলিয়াছ ভাই! হাঁ, চক্রায়ুধের সঙ্গে কখন সাক্ষাৎ হইতে পারে?"

"এখনই। তিনি ত এই দ্বারেই অপেক্ষা করিতেছেন। অনুমতি হইলেই আসিতে পারেন।"

"হাঁ, আসুন। বিজয়বতী!"

প্রতিহারী বিজয়বতী আসিয়া অভিবাদন করিল। ধর্ম্মপাল কহিলেন, "বাহিরে বিদেশী একজন অতিথি অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে পাঠাইয়া দেও।"

"যে আজ্ঞা মহারাজ!"

বলিয়া বিজয়বতী চলিয়া গেল। একটু পরেই চক্রায়ুধ গৃহে প্রবেশ করিলেন। অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "জয় হউক মহারাজ!"

সম্ভ্রমে আসন হইতে উঠিয়া ধর্ম্মপাল কহিলেন, "আসুন মহারাজ চক্রায়ুধ! এই আসনে বসুন, আপনার কুশল ত?

চক্রায়ুধ কহিলেন, "মহারাজের আশ্রয় পাইয়াছি, ইহাই যথেষ্ট কুশল বলিয়া এখন মনে করি। মহারাজ কুশলে আছেন ত?"

বলিয়া চক্রায়ুধ একটি আসনে বসিলেন। ধর্ম্মপাল কহিলেন, "ভগবান্ তথাগতের* কৃপায় কুশলেই আছি। এখন আপনার সংবাদ কি বলুন।"

চক্রায়ুধ উত্তর করিলেন, "সংবাদ সবই মহারাজ জানেন। আপনার আশ্রয় আমি প্রার্থনা করি।"

ধর্ম্মপাল উত্তর করিলেন, "বিপন্ন হইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছেন, বাঙ্গালা আপনাকে রক্ষা করিবে। নির্ভয়ে আপনি এখানে থাকিবেন। এখন একটি কথা জানিতে চাই। ইন্দ্রায়ুধের অভিপ্রায় কি? মনে ত হয়, তিনি আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইতে চান।"

"মগধ আর বাঙ্গালা জয় করিতে পারিলে তাই হইবেন।"

ধর্ম্মপাল কহিলেন, "বাঙ্গালামগধের সে দুর্দ্দিন আর নাই।"

বাকৃপাল কহিলেন, "আর ইন্দ্রায়ুধও এত বড় হন নাই যে বাঙ্গালা মগধ আক্রমণ করিতে সাহসী হইবেন।"

চক্রায়ুধ কহিলেন, "অবন্তি, ভোজ, মৎস্য, যদু, কুরু, কীর, যবন, গান্ধার, উত্তর ভারতের সব রাজারাই এখন তাঁহার সহায়। ইঁহাদের সকলের বল যদি পান, বাঙ্গালা জয় করাও একেবারে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে না। তাঁহার শত্রু হইয়া আমি আপনার আশ্রয় লইয়াছি এই ছল ধরিয়া শীঘ্রই তিনি বাঙ্গালা আক্রমণ করিবেন বলিয়া আমার মনে হয়।"

একটু হাসিয়া ধর্ম্মপাল কহিলেন, "হুঁ, তাহা হইলে আপনিই দেখিতেছি আমাকে বিপন্ন করিলেন।"

চক্রায়ুধ উত্তর করিলেন, "বাঙ্গালার অধীশ্বর ধর্ম্মপালদেব ইচ্ছা করিলেই

* পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধেরা সাধারণতঃ বুদ্ধদেবকে "তথাগত" বলিতেন। কথাটার অর্থ—পুনর্জ্জন্ম না হয় এইভাবে গতি যাঁহার হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

আমাকে ত্যাগ করিয়া, কি শত্রুর হাতে সঁপিয়া দিয়া এই বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।"

আবার হাসিয়া ধৰ্ম্মপাল কহিলেন, "আপনি যে বাঙ্গালার আশ্রয় লইয়াছেন মহারাজ! বিপদের ভয়ে বাঙ্গালা কি তার আশ্রিতকে ত্যাগ করিতে পারে? না শত্রুর হাতে সঁপিয়া দিতে পারে?"

বাক্‌পাল বলিয়া উঠিলেন, "বিপদ! কি বিপদ? কিসের ভয় মহারাজ? হাঁ, ইন্দ্রায়ুধ বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে পারেন। আচ্ছা, আসুন তবে; লড়িয়াই দেখা যাইবে পরের বলে ইন্দ্রায়ুধ কতই বড় হইয়াছেন।"

চক্রায়ুধ কহিলেন, "লড়িতেই যদি চান, শত্রুর রাজ্যমধ্যে আগে গিয়া লড়ুন। শত্রু আসিয়া দেশ আক্রমণ করিবে, তার জন্য অপেক্ষা করিবেন না।"

ধৰ্ম্মপাল কহিলেন, "না, রাজনীতির জ্ঞান কিছু আছে, এমন কেহ তা করে না। ঘরের দুয়ারে শত্রু আসিবার আগেই গিয়া শত্রুকে যে আক্রমণ করিতে পারে, জয়লাভের আশা তার অনেক বেশী। হাঁ, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, মহারাজ! গুৰ্জ্জরের নাগভট কি উত্তর-ভারত জয় করিতে কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন? শুনিয়াছি রাষ্ট্রকূট গোবিন্দ ছাড়া তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী রাজা আর কেহ ওদিকে নাই।"

চক্রায়ুধ উত্তর করিলেন, "ঠিকই শুনিয়াছেন মহারাজ! ইন্দ্রায়ুধ তাঁহার কাছে কিছুই নয়। ইন্দ্রায়ুধের মিত্র হইয়া যাঁহারা দাঁড়াইয়াছেন, অনেকেই তাঁহারা গুৰ্জ্জর প্রতীহারদের সঙ্গে সমান এক জাতির বিভিন্ন বংশ। সহজেই ইঁহারা নাগভটের বাধ্য হইতে পারেন। যদি হন, ইন্দ্রায়ুধের রাজ্য তখনই তাঁহার হাতে যাইবে। আর তারপর যতই শক্তিশালী আজ হউন, নাগভটের আক্রমণ হইতে বাঙ্গালা আপনি রক্ষা করিতে পারিবেন না।"

উত্তেজিত ভাবে বাক্‌পাল বলিয়া উঠিলেন, "পারিব না! আচ্ছা আসুন নাগভট! তখন দেখিব।"

ধর্ম্মপাল কহিলেন, "শান্ত হও বাক্‌পাল। নাগভট যদি উত্তর-ভারত জয় করিয়া বাঙ্গালার দিকে আসেন, বাঙ্গালা রক্ষা করা খুব সহজ হইবে না। ইন্দ্রায়ুধকে আমি ভয় করি না। তবে নাগভট যদি এইভাবে প্রস্তুত হন, তাঁহার সঙ্গে যুঝিয়া উঠা বড় সহজ হইবে না।"

"প্রস্তুত হইবার আগেই যদি আমরা উত্তর-ভারত জয় করিয়া লইতে পারি?"

"তা যদি পারি আর কান্যকুব্জরাজ যদি আমাদের মিত্র থাকেন, তবে আর নাগভটকে ভয় করি না।" বলিয়া ধর্ম্মপাল চক্রায়ুধের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "কি বলেন মহারাজ?"

চক্রায়ুধ কহিলেন "আমি কি বলিতে পারি মহারাজ? কান্যকুব্জরাজ ইন্দ্রয়ুধ যে আপনার শত্রু।"

"না, চক্রায়ুধ! আজ ইন্দ্রায়ুধ আছেন, কাল চক্রায়ুধ হইবেন। চক্রায়ুধ আমার শত্রু নন, মিত্র। নন কি মহারাজ?"

চক্রায়ুধ কহিলেন, "হাঁ, চক্রায়ুধ আপনার মিত্র। কান্যকুব্জ যদি আপনার সহায়তায় পাই, কান্যকুব্জের সকল বল আপনারই হইবে। আর সেই বলে উত্তর-ভারতের চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ আপনি হইবেন।"

"উত্তম! অবিলম্বেই তবে আমরা যুদ্ধ যাত্রা করিব। বাক্‌পাল!"

"আজ্ঞা করুন, মহারাজ!"

"কবে যাত্রা করিতে পারিবে?"

"যেদিন আদেশ করিবেন।"

"আজ হইতে তৃতীয় দিনে?

"তাহাই হইবে।"

(৩)

তৃতীয় দিনেই ধর্ম্মপাল বাঙ্গালী সেনা লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পথে প্রথম বাধা আসিল কাশীতে। প্রবল বেগে বাঙ্গালী সেনা কাশী আক্রমণ করিল। দুই তিন দিন যুদ্ধের পরই নগর ধর্ম্মপালের হাতে পড়িল। পরে আবার কোন গোলযোগ উপস্থিত না হয়, তারজন্য নিপুণ এক জন সেনানীর হাতে একদল সেনা কাশীতে রাখিয়া ধর্ম্মপাল পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই ইন্দ্রায়ুধ ও তাঁহার সব মিত্ররাজাদের পরাজিত করিয়া ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জ অধিকার করিলেন।

তারপর মহাসমারোহে তিনি চক্রায়ুধের অভিষেকের আয়োজন করিলেন। উত্তরভারতের রাজা যাঁহারা ইন্দ্রায়ুধের মিত্র ছিলেন, সকলকেই একেবারে বাধ্য করিয়া ফেলিতে হইবে, ইহাই ছিল ধর্ম্মপালেব অভিপ্রায়। অবন্তি, ভোজ, মৎস্য, কুরু, যদু, কীর, গান্ধার, যবন সব রাজাদেরই কান্যকুব্জে উপস্থিত হইতে আদেশ পাঠাইলেন। আদেশ অবহেলা করিতে কাহারও সাহস হইল না; সকলেই কান্যকুব্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রাচীন একখানি গ্রন্থে এই অভিষেক উৎসবের সুন্দর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সোনার কাজ করা প্রকাণ্ড একটা চাঁদোয়ার নীচে সভা হইল। মাঝখানে এক সিংহাসনে ধর্ম্মপাল বসিলেন; মণিমুক্তায় খচিত একটি রাজছত্র তাঁহার মাথার উপরে ধরা হইল। সুবেশধারী কয়েকজন পরিচারক দুইপাশে দাঁড়াইয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিল। ডান ধারে আর একখানি সিংহাসনে বসিলেন চক্রায়ুধ। বাঁ দিকে অবন্তি, ভোজ, মৎস্য, যদু, কুরু, কীর, গান্ধার ও যবন এই আট দেশের আট জন

রাজা নতশিরে দাঁড়াইলেন। মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মঙ্গল গীত হইল,—বন্দীরা* মহারাজ ধর্ম্মপালের বীরকীর্ত্তির গাথা গাহিল।

তারপর ধর্ম্মপাল আদেশ করিলে; পাঞ্চালবৃদ্ধেরা (অর্থাৎ পাঞ্চাল বা কান্যকুব্জের পণ্ডিতব্রাহ্মণরা) সোনার কলস হইতে তীর্থের পবিত্র জল লইয়া চক্রায়ুধের মাথায় ছিটাইতে লাগিলেন ‡।

চক্রায়ুধের অভিষেক হইল কান্যকুব্জের রাজসিংহাসনে। কিন্তু নামে না হইলেও কাজে সঙ্গে সঙ্গে অভিষেক হইয়া গেল, উত্তর-ভারতের সম্রাট্ রূপে ধর্ম্মপালের।

সংবাদ নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল সকলেই স্বীকার করিয়া লইলেন বাঙ্গালার ধর্ম্মপাল উত্তর-ভারতের সম্রাট্ হইলেন।

অন্য রাজারা সকলেই অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। চক্রায়ুধ নিজেও এখন অধীন মিত্র। তাঁহারই হাতে কান্যকুব্জের শাসন এবং এই অঞ্চলের উপরে একটা কর্ত্তৃত্বের ভার রাখিয়া ধর্ম্মপাল বাঙ্গালার পথে ফিরিলেন।

(৪)

ওদিকে পরাজয়ের পর ইন্দ্রায়ুধ গিয়া গুর্জ্জররাজ নাগভটের আশ্রয় লইলেন। ধর্ম্মপাল যে এত তাড়াতাড়ি উত্তরভারত জয় করিয়া ফেলিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া নাগভটও বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইন্দ্রায়ুধ আসিয়া যখন তাঁহার আশ্রয় লইলেন, তাঁহার মনে হইল উত্তর ভারতের সাম্রাজ্য পাইতে হইলে এই শুভ সুযোগ। বিলম্ব না করিয়া ইন্দ্রায়ুধকে লইয়া তিনি কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন। চক্রায়ুধকে দূর

* রাজাদের বীরত্ব মহিমাদির স্তুতি বা বন্দনা যাহারা গান করে, তাহাদের 'বন্দী' বলে। এইরূপ লোক রাজবাড়ীতে নিযুক্ত থাকিত এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই সব গান করিত।

‡ মন্ত্র পড়িয়া নানা তীর্থের জল রাজার মাথায় সেচন বা অভিষেচন করা হয়, তাই এই অনুষ্ঠানেরই নাম হইয়াছে অভিষেক।

ধর্ম্মপালের যুদ্ধ যাত্রা।

করিয়া দিয়া তাঁহাকেই আবার কান্যকুব্জের সিংহাসনে বসাইলেন। তাঁহার অধীনে সামান্য যে সেনা ছিল, তাহা লইয়া চক্রায়ুধ আবার বাঙ্গালার দিকে চলিয়া গেলেন।

বাঙ্গালার সীমান্তে আসিয়া ধর্ম্মপাল পৌছিয়াছেন। দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ আবার তাঁহার বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিতেছেন, দেশ ভরিয়া আনন্দ উৎসবের আয়োজন হইল। প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সীমান্তে তাঁহার শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহা আড়ম্বরে শোভাযাত্রা করিয়া ধর্ম্মপালকে লইয়া ইঁহারা বাঙ্গালায় প্রবেশ করিবেন, এমন সময় এক অশ্বারোহী দূত আসিয়া এক নূতন বিপদের সংবাদ জানাইল।

ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চক্রায়ুধ কোথায়?"

"তিনিও এদিকে আসিতেছেন। শীঘ্রই আসিয়া পৌছিবেন।"

"তাঁহার সঙ্গে কান্যকুব্জের সেনা কিছু আছে?"

"আছে। কিন্তু খুব বেশী নয়।"

বাক্‌পাল কহিলেন—"পরাজয়ের পর পলাইয়া আসিতেছে, সাহস বল বড় কিছু তাদের নাই। এই সেনার দ্বারা কি এমন সাহায্য হইবে মহারাজ?"

ধর্ম্মপাল কহিলেন, "এদিকে এতদিন ধরিয়া যুদ্ধের পর আমাদের সেনাও বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

"কিন্তু সাহস বল তাহারা কিছু হারায় নাই। আপনি আদেশ করিলে আনন্দেই তাহারা আবার যুদ্ধে যাইবে।"

"তা যাইবে জানি বাক্‌পাল। এত বড় সাম্রাজ্য একবার জয় করিয়া শত্রুর হাতে তাহা ছাড়িয়া দিয়া হেঁট মুখে তারা বাঙ্গালায় ফিরিবে না।" সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া ধর্ম্মপাল বলিলেন,—"কেমন? বাঙ্গালায় ফিরিয়া যাইবে তোমরা?"

করিয়া দিয়া তাঁহাকেই আবার কান্যকুব্জের সিংহাসনে বসাইলেন। তাঁহার অধীনে সামান্য যে সেনা ছিল, তাহা লইয়া চক্রায়ুধ আবার বাঙ্গালার দিকে চলিয়া গেলেন।

বাঙ্গালার সীমান্তে আসিয়া ধর্ম্মপাল পৌছিয়াছেন। দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ আবার তাঁহার বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিতেছেন, দেশ ভরিয়া আনন্দ উৎসবের আয়োজন হইল। প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সীমান্তে তাঁহার শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহা আড়ম্বরে শোভাযাত্রা করিয়া ধর্ম্মপালকে লইয়া ইঁহারা বাঙ্গালায় প্রবেশ করিবেন, এমন সময় এক অশ্বারোহী দূত আসিয়া এক নূতন বিপদের সংবাদ জানাইল।

ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চক্রায়ুধ কোথায় ?"

"তিনিও এদিকে আসিতেছেন। শীঘ্রই আসিয়া পৌছিবেন।"

"তাঁহার সঙ্গে কান্যকুব্জের সেনা কিছু আছে ?"

"আছে। কিন্তু খুব বেশী নয়।"

বাক্‌পাল কহিলেন—"পরাজয়ের পর পলাইয়া আসিতেছে, সাহস বল বড় কিছু তাদের নাই। এই সেনার দ্বারা কি এমন সাহায্য হইবে মহারাজ ?"

ধর্ম্মপাল কহিলেন, "এদিকে এতদিন ধরিয়া যুদ্ধের পর আমাদের সেনাও বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

"কিন্তু সাহস বল তাহারা কিছু হারায় নাই। আপনি আদেশ করিলে আনন্দেই তাহারা আবার যুদ্ধে যাইবে।"

"তা যাইবে জানি বাক্‌পাল। এত বড় সাম্রাজ্য একবার জয় করিয়া শত্রুর হাতে তাহা ছাড়িয়া দিয়া হেঁট মুখে তারা বাঙ্গালায় ফিরিবে না।" সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া ধর্ম্মপাল বলিলেন,—"কেমন ? বাঙ্গালায় ফিরিয়া যাইবে তোমরা ?"

প্রধান প্রধান সেনানী যাঁহারা কাছে ছিলেন, তাঁহাদের দিকে চাহিয়া ধর্ম্মপাল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এককণ্ঠে সকলে উত্তর করিলেন, "না মহারাজ! প্রাণ থাকিতে নয়! এই সাম্রাজ্য যদি আবার জয় করিয়া লইতে পারি, মাথা উঁচু করিয়া যদি বাঙ্গালায় ফিরিতে পারি, তবেই ফিরিব। নতুবা গঙ্গাযমুনার মিলনক্ষেত্রে কি রাজপুতানার মরুভূমিতে সকলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব!"

"আর আপনারা?—আপনারা কি অনুমতি করেন?"—বলিয়া অভ্যর্থনার জন্য সমাগত বাঙ্গালী জাতির মুখপাত্রগণের দিকে ধর্ম্মপাল চাহিলেন। তাঁহারাও সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ মহারাজ ধর্ম্মপালকে আমরা জয়গৌরবে বাঙ্গালায় ফিরাইয়া লইতে আসিয়াছি। যত দিনেই হউক, তাই লইব মহারাজ! আবার আপনি যুদ্ধযাত্রা করুন, আবার আর্য্যাবর্ত্তে বাঙ্গালীর জয়পতাকা উড়াইয়া আসুন, আবার আমরা আসিব। ভারতের শ্রেষ্ঠ বীর ভারতবিজয়ী মহারাজকে অধিকতর সমারোহে বাঙ্গালায় অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইব! জয় মহারাজ ধর্ম্মপালের জয়! জয় রাজাধিরাজ ভারতচক্রবর্ত্তীর জয়!"

যত প্রজা, যত সৈন্য ছিল, সকলে এই জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনি করিল,—"জয় মহারাজ ধর্ম্মপালের জয়! জয় রাজাধিরাজ ভারতচক্রবর্ত্তীর জয়!"

(৫)

শিবির ভরিয়া সাড়া পড়িয়া গেল। নূতন উৎসাহে সৈন্য সব আবার যুদ্ধের জন্য সাজিল। পর দিন প্রত্যূষেই ধর্ম্মপাল পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন। পথে চক্রায়ুধ আসিয়া তাঁহার সেই ছিন্নভিন্ন সেনাদল লইয়া ধর্ম্মপালের সঙ্গে যোগ দিলেন। বাঙ্গালী সেনার উৎসাহের সাড়া পাইয়া কনোজী সেনাও নূতন উৎসাহবলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল। আরও

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ধর্ম্মপাল সংবাদ পাইলেন, নাগভট অতি বৃহৎ একদল গুর্জ্জর-রাজপুত সেনা লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আসিতেছেন ; আর অবন্তি, ভোজ, মৎস্য প্রভৃতির রাজারাও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। তুলনায় তাঁহার বাঙ্গালী সেনা অনেক দুর্ব্বল। আর উৎসাহ উদ্যম যতই তাহাদের থাক, দেশে দেশে এতদিন ধরিয়া এত যুদ্ধে তাহারা বড়ই ক্লান্ত। তাহারা নাগভট আর তাঁহার মিত্রদের বৃহৎ বাহিনীর আক্রমণের বেগ সামলাইতে পারিবে না। এখন তবে কর্ত্তব্য কি ?

বাক্‌পাল কহিলেন, "তবে কি পিছু হঠিয়া বাঙ্গালার দিকে ফিরিতে হইবে, মহারাজ ?",

"না ! সৈন্যেরা আমাকে শক্তিহীন মনে করিয়া ভয় পাইবে। নাগভট পিছনে আসিয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করিবেন। আর তার বেগ তখন বাঙ্গালীরা সামলাইতে পারিবে না।"

"কি ! গুর্জ্জর নাগভট বাঙ্গালা জয় করিবে ?"

"করিতে পারে, যদি আমরা এখন ফিরি।"

"তবে ফিরিবার কথা কেন ভাবিতেছেন মহারাজ ?

হাসিয়া ধর্ম্মপাল কহিলেন, "কই, এমন কথা ত আমি ভাবি নাই বাক্‌পাল ! তুমিই অনুমান করিতেছ, এই সঙ্কটে এই কথাই বুঝি আমার মনে হইতেছে।"

লজ্জা পাইয়া বাক্‌পাল কহিলেন, "মার্জ্জনা করুন মহারাজ ! এইরূপ হীন একটা সন্দেহ আমার মনে উঠিয়াছিল সত্য। কিন্তু ওঠা উচিত হয় নাই। হাঁ, সঙ্কট যে অতি দারুণ, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু তাই বলিয়া—

"না, পিছু হঠিয়া হেঁটমুখে বাঙ্গালায় ফিরিতে পারিনা। আর ফিরিয়াও কোনও লাভ নাই। বাঙ্গালার সঙ্গে বাঙ্গালার গৌরবও গুর্জ্জর নাগভটের পায়ের তলে ধুলায় লুটাইবে।"

বাক্‌পাল কহিলেন, "আচ্ছা, এখানে পরিখা কাটিয়া যদি গড় তুলিয়া অপেক্ষা করি ?"

"কতদূর পরিখা করিবে ? কতদূর ধরিয়া গড় তুলিবে ? বিস্তৃত দেশ ; অন্যপথে ঘুরিয়া নাগভট পিছন হইতে আমাদের আক্রমণ করিবেন। তবে চারিদিক ঘিরিয়া যদি গড় তুলিতে পার। কিন্তু তাহাতে চারিদিক হইতেই হয়ত আট্‌কা পড়িয়া মরিব।"

বাক্‌পাল কহিলেন, "অগ্রসর হইয়াই তবে নাগভটকে আক্রমণ করিব। মরিতেই যদি হয়, বীরের মত যুদ্ধ করিয়াই মরিব !"

ধর্ম্মপাল উত্তর করিলেন, "বাঁচিবার কোনও পথ থাকিলে আগেই কেন মরিব ? আমরা মরি ক্ষতি নাই, বাক্‌পাল ! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাঙ্গালাও মরিবে যে !"

"বাঁচিবার পথ তবে কিছু আছে, মহারাজ ?"

"আছে। আজই ছাউনী তোল। দক্ষিণ দিকে চল।"

"দক্ষিণ দিকে ? কোথায় মহারাজ ? দক্ষিণের দিকে—"

"হাঁ, আগে দক্ষিণে গিয়া ঘুরিয়া শেষে পশ্চিমে যাইতে হইবে।"

"নাগভটের পিছনে গিয়া তবে গুর্জ্জর আক্রমণ করিতে চান ?"

ধর্ম্মপাল কহিলেন, "যদি সম্ভব হইত বাক্‌পাল, তাই করিতাম। কিন্তু সম্ভব তা হইবে না। গুর্জ্জর একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া নাগভট আসেন নাই। বিশেষ অত বড় প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ নিকটেই রহিয়াছেন।"

"এই গোবিন্দ তবে আমাদের সহায় হইতে পারেন !"

"হাঁ, সেই ভরসায় রাষ্ট্রকূট রাজ্যেই এখন যাইব।"

"কিন্তু তিনি যদি সহায় না হন্ ? বিপক্ষতাই যদি করেন ?"

ধর্ম্মপাল কহিলেন, "না, তা করিবেন না, সহায়ই হইবেন। নাগভট

যখন তাঁহারও শত্রু, তখন আমাকে মিত্র মনে করিবারই কথা। জান ত, রাজনীতির এই নিয়ম যে পাশের রাজা শত্রু আর তার দূরের রাজা মিত্র। একা হয়ত তিনি যুঝিতে সাহস পাইতেছেন না। আমাকে পাইলে নূতন উৎসাহে আসিয়া যোগ দিবেন। আর দুইজনের বল এক হইলে নাগভট তার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবেন না। কি বলেন মহারাজ চক্রায়ুধ ?"

চক্রায়ুধ কহিলেন, "হাঁ, ইহাই এই সঙ্কটে উত্তম পরামর্শ। আপনাকে পাইলে রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ পরম মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিবেন। একদিকে আপনি আর গোবিন্দ, আর একদিকে একা নাগভট। সাধ্য কি সে যুঝিতে পারে ?"

(৬)

তখনই আদেশ ঘোষিত হইল। ছাউনী তুলিয়া বাঙ্গালী আর কনোজী সেনা দক্ষিণদিকে যাত্রা করিল।

রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দের নিকটে দ্রুতগামী এক দূত পাঠান হইল। তাঁহারই শত্রু নাগভটকে দমন করিবার জন্য বাঙ্গালার ধর্ম্মপাল তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে আসিতেছেন, এই সংবাদে গোবিন্দ বড় আনন্দিত হইলেন। তখনই প্রধান প্রধান সামন্তদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ধর্ম্মপালের সঙ্গে যোগ দিয়া নাগভটের বিরুদ্ধে অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করা উচিত, সকলেই এই কথা বলিলেন।

রাজা গোবিন্দের একজন আত্মীয় ও সামন্ত রাজা ছিলেন, পরবল! পরবল কহিলেন, "মহারাজ! আমার একটি কথা আছে। ধর্ম্মপাল মহাবীর; আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ একবার তিনি হইয়াছেন, আবারও

হইবেন। একমাত্র বিপক্ষ তাঁহার নাগভট। আমরা সহায় থাকিলে তাঁহার আর কোনও অনিষ্ট নাগভট করিতে পারিবেন না। আবার তিনি সহায় থাকিলে আমাদেরও নাগভটের দিক হইতে কোন ভয় থাকিবে না। তবে আর একটা কথা ভাবিবারও আছে। বিপন্ন হইয়া ধর্ম্মপাল আজ আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আসিতেছেন। কিন্তু কেবল রাজনীতির প্রয়োজনে এইরূপ মিত্রতার যোগ বহুদিন স্থায়ী হয় না। আজ যিনি সপক্ষ, রাজনীতির অন্যপ্রকার প্রয়োজনে কাল তিনি বিপক্ষ হইয়াও দাঁড়াইতে পারেন।"

গোবিন্দ কহিলেন, "রাজনীতির রীতিই এই। রাজনীতিতে যখন যেরূপ দরকার, রাজাদের মিত্রতার যোগ আর শত্রুতার বিরোধ সেই হিসাবে প্রায় হইয়া থাকে। তাহা হইলে আপনি কি বলিতে চান?"

"এমন কোনও আত্মীয়তার যোগ কি ধর্ম্মপালের সঙ্গে ঘটান যায় না যাহাতে চিরকাল একটা মিত্রতার সম্বন্ধেই তিনি আমাদের সঙ্গে বাঁধা থাকেন?"

হাসিয়া গোবিন্দ কহিলেন, "ধর্ম্মপালের কোনও কন্যা নাই। তাহা হইলে আপনার সঙ্গে তাহার বিবাহে এই বাঁধনটা ঘটাইবার চেষ্টা করিতাম।"

পরবলও হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কন্যা থাকিলেও এই বৃদ্ধের হাতে ধর্ম্মপাল তাহাকে দিতেন না। তবে এই বৃদ্ধের কন্যাটিকে দিলে নিতে পারেন।"

আনন্দে সকলে বলিয়া উঠিলেন, "উত্তম! উত্তম! পরবলের কন্যা রন্নাদেবীকেই ধর্ম্মপালের হাতে দেওয়া হউক!"

গোবিন্দ কহিলেন, "হাঁ, ধর্ম্মপালকে রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে বাঁধিবার এমন সূত্র আর হইতে পারে না। রূপে গুণে রন্নাদেবী ধর্ম্মপালের মহিষী হইবারই

যোগ্য। এমন রত্ন দিলে তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না। আচ্ছা, আসুন তবে তিনি। দেখি, বাঁধিতে পারি কি না।"

কয়েকদিনের মধ্যেই ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ্যের সীমান্তে আসিয়া পঁহুছিলেন। বহু লোকজন হাতী ঘোড়া সঙ্গে লইয়া গোবিন্দ প্রধান প্রধান কয়েকজন সামন্তকে পাঠাইলেন। মহাসমারোহে তাঁহারা ধর্ম্মপালকে রাজধানীতে লইয়া আসিলেন।

রন্নাদেবীকে দেখিয়া, তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া, ধর্ম্মপাল বড় আনন্দিত হইলেন। শীঘ্রই এক শুভদিনে ধর্ম্মপালের সঙ্গে রন্নাদেবীর বিবাহ হইল। তারপর রাষ্ট্রকূট সেনা আর বাঙ্গালী সেনা লইয়া গোবিন্দ ও ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জের দিকে যাত্রা করিলেন। এই সব সংবাদ পাইয়া নাগভটও তাঁহার সব সেনা লইয়া ফিরিলেন। কান্যকুব্জের নিকটে দুই পক্ষে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল।

নাগভটের সেনা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ইন্দ্রায়ুধকে লইয়া রাজপুতানার মরুভূমি অঞ্চলে গিয়া তিনি আশ্রয় লইলেন।

(৭)

কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া আবার চক্রায়ুধকে সিংহাসনে বসান হইল। স্পষ্টভাবেই এবার চক্রায়ুধ আপনাকে ধর্ম্মপালের সামন্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন।

নাগভট আবার মাথা তুলিয়া বিরুদ্ধতা কিছু করিবেন, ইহার কোন সম্ভাবনাই রহিল না। বিজয়গৌরবে সম্রাট্ ধর্ম্মপাল বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। বাঙ্গালী-প্রধানেরা আবার সীমান্তে আসিয়া উৎসব-আড়ম্বরে ধর্ম্মপালকে বাঙ্গালায় লইয়া গেলেন।

দীর্ঘকাল মহাগৌরবে রাজত্ব করিয়া বৃদ্ধবয়সে ধর্ম্মপাল দেহত্যাগ করেন।

প্রজারা তাঁহার পিতা গোপালকে বাঙ্গালার রাজা করিয়াছিলেন। প্রজারা সন্তুষ্ট থাকিলে তাঁহার ও তাঁহার বংশের রাজত্ব বাঙ্গালায় অক্ষয় হইয়া থাকিবে, ধর্ম্মপাল ইহা বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়া দেশের সুখশান্তি যাহাতে বাড়ে, নিশ্চিন্ত হইয়া প্রজারা সকল দিকে উন্নতি করিতে পারে, সর্ব্বদাই তিনি তাহাতে মনোযোগী থাকিতেন। চরিত্রের অশেষ গুণে, আর বহু মঙ্গলকর কর্ম্মেও, অবিরত প্রজারঞ্জনে ধর্ম্মপাল সকলের এত প্রিয় হইয়াছিলেন যে, সীমান্ত প্রদেশের গোপেরা, বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে গৃহস্থগণ, গৃহের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে খেলার সময় সব শিশুরা, সর্ব্বদা ধর্ম্মপালের কীর্ত্তিগান করিত। শুনিয়া শুনিয়া খাঁচায় পোষা শুকপাখীরাও সর্ব্বত্র এই স্তুতিগানের প্রতিধ্বনি করিত। নিজের এত স্তুতি শুনিয়া ধর্ম্মপালকে অনেক সময় লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া থাকিতে হইত।

আবার তাঁহার প্রতাপ এত ছিল যে তাঁহার সেনা যখন যুদ্ধে যাইত, ধূলিতে চারিদিক অন্ধকার হইয়া পড়িত, 'ঘনাঘন' নামে তাঁহার রণহস্তী সকল যখন কোথাও যাইত, লোকের মনে হইত যেন ঝড়ের মেঘ সাজিয়া চলিয়াছে। গঙ্গার মোহনায় তাঁহার যুদ্ধজাহাজগুলি বাঁধা থাকিত, মনে হইত যেন সেতুবন্ধের কাছে পাহাড়ের সারি দাঁড়াইয়া আছে।

এই সময় শিল্পকলায় বাঙ্গালী অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালায় ও বিহারে অনেক সুন্দর সুগঠিত ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে। ঐতিহাসিকগণের মতে ধর্ম্মপাল ও তাঁহার বংশধর পাল-রাজাদের সময়েই এইগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল।

রামপাল—দিব্বোক ও ভীম

(১)

ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দেবপাল সম্রাট্ হন। ইনিও একজন মহাবীর রাজা ছিলেন, আর তাঁহার বড় সহায় ছিলেন বাক্পালের পুত্র মহাবীর জয়পাল। ইঁহার সহায়তায় দেবপাল দক্ষিণে ও পশ্চিমে আরও অনেক রাজ্য জয় করিয়া বাঙ্গালার সাম্রাজ্যটিকে আরও বড় করিয়া তুলেন। কামরূপের রাজাও ইঁহার অধীনতা স্বীকার করেন।

দেবপালের পর দুইশত বৎসরের অধিক কাল পালবংশের রাজারা বাঙ্গালা শাসন করেন। রাজা যদি প্রজার কল্যাণসাধনের জন্য সর্ব্বদা যত্ন করেন, তবেই প্রজা রাজাকে ভালবাসে, রাজার বাধ্য হইয়া থাকে। রাজার গুণে, প্রজা যে দেশে রাজার যত বাধ্য থাকে, সে দেশ ততই ধনে জনে আর বহুবিধ সৎকর্ম্মে উন্নত হইয়া ওঠে, রাজার শক্তিবলও ততই বাড়ে, তাঁহার সিংহাসনও দেশে তত অটল হইয়া থাকে।

পালরাজারা সকলেই বহুগুণে প্রজাদের বড় প্রিয় ছিলেন, এবং দুইশত বৎসরের অধিককাল তাঁহারা রাজত্ব করেন। বাহিরের রাজাদের সঙ্গে অনেক সময়ে অনেক যুদ্ধ হইয়াছে। হার জিত যখনই যাহা হউক, বাঙ্গালায় আর মগধে তাঁহাদের মূল রাজ্যে নির্ব্বিঘ্নে ও গৌরবেই পাল রাজারা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

বড় এক রাজা ছিলেন মহীপাল। দিনাজপুরে ইঁহার একটি কীর্ত্তি আছে, অতি প্রকাণ্ড এক দীঘি। মহীপাল এই দীঘি কাটান, এবং লোকে

এখনও ইহাকে 'মহীপালের দীঘি' বলে। মুরশিদাবাদ জেলায় 'সাগর দীঘি' নামে আর একটি বড় দীঘিও মহীপাল খনন করান। বগুড়া জেলায় 'মহীপুর,' দিনাজপুর জেলায় 'মহীসন্তোষ,' আর মুরশিদাবাদ জেলায় 'মহীপাল'—এই তিনটি গ্রামে মহীপালের নামে প্রাচীন তিনটি নগরের চিহ্নও পাওয়া যায়। ইনি কাশীতে কয়েকটি বড় মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সারনাথে যে বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপ আছে, তাহার অনেক অংশ জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল মহীপাল তাহারও সংস্কার করেন।

ইনি ছিলেন মহীপাল নামের প্রথম রাজা, তাই ইহাকে লোকে প্রথম মহীপাল বলে। এই প্রথম মহীপালের প্রপৌত্রের নামও ছিল মহীপাল। দ্বিতীয় মহীপাল নামে ইনি পরিচিত। যে সব গুণে পালরাজারা প্রজার এতপ্রিয় ছিলেন, সে সব গুণ কিছুই ইঁহার ছিল না। ভোগবিলাসেই সর্ব্বদা ইনি মত্ত থাকিতেন আর প্রজাদের উপর নানারকম অত্যাচার করিতেন। অবিরত অত্যাচারে প্রজারা যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। ইঁহার এক ভাই ছিলেন রামপাল। চরিত্রগুণে ইনি প্রজাগণের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রজাদেরও ইনি বড় ভাল বাসিতেন। রাজার অত্যাচারে প্রজারা এত দুঃখ পায়, রামপাল তাহা সহিতে পারিতেন না। কিসে ইহার প্রতিকার হইতে পারে, সর্ব্বদাই তার চেষ্টা করিতেন। প্রজারা তাঁহার বড় অনুগত হইয়া উঠিল। এমন কথাও অনেকে বলিত, মহীপালকে দূর করিয়া দিয়া রামপালকেই রাজা করিবে।

মহীপালের বড় ভয় হইল। সন্দেহ হইল, রাজা হইবার জন্য রামপাল প্রজাদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন। রামপালকে তিনি কারাগারে লোহার শিকলে বাঁধিয়া রাখিলেন।

কিন্তু ইহাতে কি হইবে? রামপালের কোন প্রকার বিরুদ্ধ চেষ্টার জন্য নয়, রাজার অমানুষিক অত্যাচারেই প্রজাদের মধ্যে বড় একটা অসন্তোষের

ভাব দেখা যাইতেছিল। রামপাল তাহাদের বন্ধু ছিলেন, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করায় এই অসন্তোষ আরও বাড়িয়া উঠিল।

রাজা অসন্তুষ্ট ও অবাধ্য প্রজাদিগকে দমন করিতে চাহিলেন। বুঝিলেন না, অত্যাচারে যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে, অধিকতর অত্যাচারেই তাহা দূর হয় না, বরং আরও বাড়িয়া ওঠে। বুঝিলেন না, সন্তুষ্ট প্রজার বলই রাজার একমাত্র বল, আর এই বল বিরূপ হইয়া দাঁড়াইলে বেশীদিন কোনও রাজাই রাজত্ব করিতে পারেন না কিন্তু মহীপালের এ সুবুদ্ধি ছিল না। সুবুদ্ধি দেয়, এমন বন্ধু স্বজনও কেহ ছিল না। যিনি ছিলেন তিনি তাঁহার ভাই রামপাল, তাঁহাকে তিনি কারারুদ্ধ করিয়াই রাখিয়াছেন।

(২)

কৈবর্ত্ত নামে বড় একটা জাতি পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্গালায় আছে। এখন ইহাদের মাহিষ্য বলে। কৃষি এবং কৃষি জাত দ্রব্যাদির বাণিজ্যই ইহাদের বৃত্তি। ইহাদের মধ্যে অনেকে প্রচুর জমিজমার মালিকও আছে। এই জাতির আর এক সম্প্রদায় মাছধরিয়া এবং নৌকা চালাইয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করে। উত্তর বাঙ্গালাতেই এই সম্প্রদায়ের লোক বেশী দেখা যায়। বহুকাল যাবৎ এই জাতি এইসব অঞ্চলে বাস করিতেছে। বলিষ্ঠ ও সাহসী বলিয়া বরাবরই ইহাদের একটা খ্যাতি আছে।

মহীপালের সময়েও বাঙ্গালার উত্তরভাগে অনেক কৈবর্ত্তের বাস ছিল। তখন এই কৈবর্ত্তদের বড় দুইজন দলপতি ছিলেন, নাম দিব্য বা দিব্বোক, আর তাঁহার এক ভাইপো ভীম।—দুইজনেই যেমন বলিষ্ঠ, তেমনই সাহসী ও নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন।

এই কৈবর্ত্তদের উপরে এমন কতকগুলি অত্যাচার মহীপাল করিলেন যে তাহারা আর সহ্য করিতে পারিল না। একটা বিদ্রোহের ভাবই

তাহাদের মধ্যে দেখা দিল। ভীম একদিন কহিলেন, "না কাকা!—এ রাজাকে আর রাখা যায় না।—"

দিব্বোক কহিলেন "হাঁ, তাই ত দেখিতেছি।—আর কিছুদিন এই অত্যাচার যদি চলে, কৈবর্ত্ত জাতি আর তাদের ধন সম্পদ মান মর্য্যাদা লইয়া দেশে থাকিতে পারিবে না।" ভীম কহিলেন, "এই হতভাগা রাজা বড়, না আমাদের এই জাত বড়, কাকা?" দিব্বোক উত্তর করিলেন, "প্রজাদের যতদিন রক্ষা করেন, সুখে রাখেন তত দিন রাজাই বড়।—জাতটাকে বলি দিয়াও তখন রাজাকে রাখিতে হয়, ভীম।"

ভীম বলিয়া উঠিলেন, "না! জাতটাকেই যদি বলি দিলাম, কার জন্য তবে রাজাকে রাখিব?"

দিব্বোক উত্তর করিলেন, "আমার এই কৈবর্ত্ত জাতটাই ত আর বাঙ্গালার সব লোক নয়, ভীম?"

"কিন্তু বাঙ্গালার ধন এরা, বল এরা! বাঙ্গালার মাটিতে সোনা ফলে কাদের লাঙ্গলে কাকা? বাঙ্গালার শত্রু নিহত হয় কাদের তরোয়ালে?" দিব্বোক কহিলেন, "কেবল কৈবর্ত্তদের নয় ভীম! কেবল কৈবর্ত্তের নয়। হাঁ, কৈবর্ত্তের এ অঞ্চলে জন বল অনেক বেশী আবার তারা বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী, যুদ্ধও করে ভাল।—তবে আরও এমন অনেক জাত আছে ভীম।—কেবল কৈবর্ত্তরাই বাঙ্গালীকে ধন-ধান্যে বল-বিক্রমে এত বড় করিয়া তুলিতে পারিত না।"

"থাক্ অনেক জাত; কিন্তু কোন জাত কৈবর্ত্তের মত সব বিষয়ে বড় নাই।—আর সে আমার জাত, কাকা!—সেই জাতকে রাজার জন্য বলি দিব না, কাকা, রাজাকে এত বেশী ভালবাসি না।"

"তেমন কোন রাজা ত দেখিস নাই ভীম, তাই একথা ব'লছিস্! —ধর্ম্মাত্মা মহারাজাদের আসনে আজ বসিয়াছে শিশুপালের মত দুরাচার

শুনিয়াছি, প্রজার সুখের জন্য তিনি প্রাণ দিতে পারিতেন। এই মহীপাল যদি সেই মহীপাল হইতেন, তবে তুইও আজ ব'লতিস ভীম,—কৈবর্ত্ত ত মোটে একটা জাত, সারাটা বাঙ্গালার সকল জাতকেই বলি দেব, রাজার মাথার একগাছি চুল রক্ষা করিতে!"

ভীম উত্তর করিলেন, 'জানি না এই মহীপাল সেই মহীপাল হইলে কি করিতাম, কি বলিতাম! তবে এই মহীপালের চাল চলন যাহা দেখিতেছি, তাহাতে রাজা আর রাজবংশের উপরেই আমার একটা দারুণ ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে।"

"কেন, কুমার রামপাল—"

"রামপাল? না, মন্দ লাগে নাই। প্রজার পক্ষে দু'কথা বলিতেন। কিন্তু কি মতলবে কে জানে! রাজা হইলে তিনিই বা কি মূর্ত্তি ধরিতেন, তাই বা কে জানে!—সে যাক্, তিনি ত এখন কারাগারে। প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলেও তাঁহার কাছে আমরা কোন সাহায্য পাইতেছি না, পাইবও না। দুরাচার দস্যু এই মহীপাল কৈবর্ত্ত জাতটাকেই পায়ে পিষিয়া ফেলিবে তাহাই সহ্য করিবে? তাও না হয় করিলে, কিন্তু সারা বাঙ্গালী জাতিকেই যে এই পাপিষ্ঠ পিষিয়া ফেলিতেছে। তাও কি ভাবিতেছ না, কাকা?"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া দিব্বোক কহিলেন, "ভাবিতেছি বই কি, ভীম! এই মহীপাল থাকিতে বাঙ্গালার আর মঙ্গল নাই। যদি পারিতাম, আজই পাপিষ্ঠকে দূর করিয়া রামপালকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইতাম।"

"পারি! কিন্তু রামপাল শ্যামপাল কোনও পালই নয়, বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইব কৈবর্ত্তরাজ দিব্বোককে।"

"পাগল! অমন কথা মুখেও আনিতে আছে? অযোধ্যার সাক্ষাৎ

সীতাপতি রামচন্দ্রের মতই আমাদের এই কুমার রামপাল আজও জীবিত আছেন যে।"

"বেশ!—যদি তাঁহাকে পাও, তাঁহাকেই বাঙ্গালার রাজা করিও। কিন্তু আগে এই মহীপালকে ত দূর কর।"

"হুঁ! কৈবর্ত্তেরা কি বলে?"

"তারা সব আগুন। তোমার মুখের কথা বাহির হইলেই হয়।"

"বেশ! মুখের কথা তবে বাহির করিলাম! তাদের প্রস্তুত হইতে বল।"

(২)

প্রধান দলপতি দিব্বোকের মুখের এই কথারই অপেক্ষা করিতেছিল সকলে।

বাতাসের আগে এই সংবাদ কৈবর্ত্তদের মধ্যে প্রচারিত হইল। গ্রামে গ্রামে গ্রাম্যনায়কদের নেতৃত্বে কৈবর্ত্তরা সব অস্ত্র লইয়া সাজিল। কয়েক দিনের মধ্যেই সকলে দলপতি দিব্বোক আর ভীমের বাড়ীতে আসিয়া জুটিল। এই বিপুল কৈবর্ত্ত সেনা লইয়া দিব্বোক আর ভীম মহীপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। প্রজারা সব অসন্তুষ্ট; রাজার সৈন্যদের মধ্যেও সুশিক্ষা কি নিয়মবাঁধন কিছু ছিল না। মহীপালের সাধ্য হইল না, প্রবল এই আক্রমণের বেগ রোধ করিতে। তিনি যে কোথায় পলাইলেন তার উদ্দেশ পাওয়া গেল না। কৈবর্ত্ত সেনা রাজপুরী অধিকার করিল।

প্রথমেই দিব্বোক রামপালের খোঁজ করিলেন। কিন্তু কারাগারে তাঁহাকে পাওয়া গেল না। মহীপাল চেষ্টা করিতেছিলেন, কারাগারে রামপালকে হত্যা করিবেন। কিন্তু বহুলোক রামপালকে বড় ভালবাসিত। ইহাদের কয়েকজনের সাহায্যে রামপাল কিছু দিন আগে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন।

রামপালকে পাওয়া গেল না, ভীম ইহাতে বড় আনন্দিত হইলেন। কহিলেন, "আর কেন কাকা ? বরেন্দ্র ভূমি (উত্তর বাঙ্গালা) আমরা জয় করিয়াছি. এ রাজ্যে আজ তোমাকেই আমরা রাজা করিব।"

এই বলিয়া মহীপালের মুকুট তিনি দিব্বোকের মাথায় পরাইয়া ছিলেন।

"জয় মহারাজ দিব্বোকের জয়! জয় কৈবর্ত্তজাতির জয়! জয় কৈবর্ত্তরাজা দিব্বোক আর ভীমের জয়!"

সকলে এই ধ্বনি করিয়া উঠিল।

দিব্বোকের আর আপত্তির কোনও উপলক্ষ রহিল না। বিজয়ী কৈবর্ত্তেরা স্বেচ্ছায় তাঁহাকে রাজা করিল। উত্তরবাঙ্গালার রাজসিংহাসনে তিনি বসিলেন।

অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন ভীম বরেন্দ্র ভূমির রাজা হইলেন। ডমর নামে একটি নগরে তাঁহার রাজধানী হইল।

(৩)

অঙ্গদেশ বা ভাগলপুর অঞ্চলের রাজা মহনদেব ছিলেন রামপালের মাতুল। পলাইয়া গিয়া রামপাল তাঁহার আশ্রয় লইয়াছি লেন। যখন শুনিলেন, কৈবর্ত্তেরা তাঁহার 'জনকভূ' বা জন্মভূমি বরেন্দ্র অধিকার করিয়াছে, তখন তাঁহার বড় দুঃখ হইল। এতকালের পালরাজবংশ—এত প্রতাপ গৌরবে যাঁহারা বাঙ্গালা শাসন করিয়াছেন—এই ভাবে আজ তাঁহাদের রাজত্বের শেষ হইল! একজন কৈবর্ত্ত শেষে তাঁহার পিতৃ-পিতামহদের সিংহাসনে বসিল, আর তিনি প্রাণ লইয়া পরের গৃহে পরের আশ্রয়ে বাস করিতেছেন! এই অমর্য্যাদা রামপালের অসহ্য হইয়া উঠিল!

মহনদেব কহিলেন, "এখন কি করিবে রামপাল ?"

"কি করিতে পারি মামা ?"

"আমার এই অঙ্গরাজ্যের সব বল আজ তোমার।"

"কিন্তু কৈবর্ত্তেরাও অতি সাহসী ও সুনিপুণ যোদ্ধা। ধনবলে আর জনবলে বাঙ্গালায় তারা বলবান। এই ধনবল আর জনবল একদিন আমারই পিতা পিতামহের হাতে ছিল। কিন্তু আজ—"

"মহীপালের পাপে হাতছাড়া হইয়াছে। আবার তোমার হাতে আসিবে।"

রামপাল উত্তর করিলেন, "কিছুই ভাবিতাম না মামা। কৈবর্ত্তেরা বাঙ্গালার রাজা হইয়াছে; বুদ্ধিমান ও শক্তিমান তারা; বাঙ্গালার গৌরব হয়ত রাখিতে পারিবে। কিন্তু পালরাজাদের মহিমা লোপ পাইল আর তাঁহাদের বংশধর আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব, তাহা উদ্ধারের কোন চেষ্টা করিব না, এটা বোধ হয় আমার উচিত হইবে না।"

মহনদেব কহিলেন, "না, তা হইবে না। একেবারেই হইবে না। চুপ করিয়া বসিয়া তুমি থাকিতে পার না। যদি থাক, তোমার পূর্ব্বপুরুষদের অভিশাপের ভাগী হইবে। দেহে শক্তি আছে, মাথায় বুদ্ধি আছে, প্রাণে তেজ আছে,—অঙ্গরাজ্যের সব বল তোমার সহায় হইবে। চল যুদ্ধে চল, তোমার পূর্ব্বপুরুষের গৌরব উদ্ধার কর।"

"কিন্তু কেবল এই অঙ্গরাজ্যের বল কি যথেষ্ট হইবে মামা? বাঙ্গালী যদি সব এই কৈবর্ত্তদের বাধ্য হইয়া পড়ে?"

"না তা পড়িবে না, পড়িতে পারে না। এতকাল যে পালরাজারা সুশাসনে বাঙ্গালাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন, ভারত ভরিয়া বাঙ্গালার গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাঁহাদের বংশধর তুমি। কে এই কৈবর্ত্ত দিব্বোক আর ভীম যে বাঙ্গালী সেই বংশধরকে অবহেলা করিয়া ইহাদের বাধ্য হইবে? হাঁ অঙ্গ ছোট রাজ্য, বলও খুব বেশী নয়। তবু তুমি প্রস্তুত হও। কেবল অঙ্গ কেন, এদিকে যত রাজ্য আছে, তার সব

রাজারাই তোমার সহায় হইবেন। পালরাজাদেরই সামন্ত ইঁহারা ছিলেন। মহীপালের অত্যাচারে যতই বিরক্ত হইয়া থাকুন, তোমাকে পাইলে তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলে, তোমার পক্ষে আসিয়া দাঁড়াইবেন।"

"সম্ভব বটে। আচ্ছা, এক কাজ করা যাউক। আমি একবার ঘুরিয়া আসি। ইঁহাদের সঙ্গে দেখা করি, দেখি ইঁহারা কি বলেন?"

মহনদেব একটু ভাবিলেন। শেষে কহিলেন, "একা তুমি যাইবে, সেটা কি ভাল হইবে রামপাল? একেবারে সেনা লইয়াই অগ্রসর হও না?"

"না! ভয় পাইয়া এক যোগে তাঁহারা বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে পারেন। এক দিকে ইঁহারা, আর এক দিকে কৈবর্ত্ত ভীম, দুই শত্রুর মাঝে আপনার সেনা কিছুই করিতে পারিবে না। ভয় নাই মামা, পাল-রাজাদের বংশধর আমি আজ বিপন্ন হইয়া যদি ইঁহাদের কাছে যাই, কেহ কোনও অনিষ্ট আমার করিবেন না। তারপর—আমি জানি, কি করিয়া ইঁহাদিগকে বাধ্য করিতে হইবে?

"সম্ভব!—তোমাকে যে একবার চিনিবে, তোমার গুণের পরিচয় যে একবার পাইবে, কিছুতেই সে তোমার শত্রু হইবে না। বুদ্ধি কৌশলও যথেষ্ট তোমার আছে। আমার ভরসা হয় তুমি ইঁহাদিগকে বাধ্য করিতে পারিবে।

"তবে অনুমতি করুন, আমি যাই।"

"যাও

(8)

কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর লইয়া রামপাল চলিয়া গেলেন। একে একে সব রাজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। রামপালের ব্যবহারে ইঁহারা এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, সকলেই তাঁহার সহায় হইয়া দাঁড়াইতে প্রস্তুত হইলেন।

বাঙ্গালার দক্ষিণভাগ তখনও কৈবর্ত্তদের হাতে যায় নাই। প্রধান প্রধান লোক যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও কেহ কেহ আসিয়া রামপালের সঙ্গে দেখা করিলেন। রামপাল বুঝিলেন, কৈবর্ত্তদের সঙ্গে যুঝিতে পারেন এরূপ বল লইয়া যদি আসিতে পারেন, আসিবামাত্র দক্ষিণ-বাঙ্গালা তাঁহার অধিকারে আসিবে।

মহনদেবকে রামপাল সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি, তাঁহার দুই পুত্র কাহ্নুর দেব ও সুবর্ণদেব এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাজদেব অঙ্গদেশের সেনা লইয়া আসিলেন। অন্যান্য সব রাজারাও আসিয়া যোগ দিলেন। সহজেই রামপাল দক্ষিণ-বাঙ্গালা অধিকার করিয়া ফেলিলেন।

তার পর বৃহৎ এক 'নৌকামেলক' বা নৌকার সেতু প্রস্তুত করাইয়া গঙ্গা পার হইয়া রামপাল বরেন্দ্র ভূমির দিকে অগ্রসর হইলেন।

ভীমের শক্তি বাস্তবিক কিরূপ ছিল, তার পরীক্ষার জন্য শিবরাজদেব ছোট একদল সেনা লইয়া কিছুকাল পূর্ব্বে একবার উত্তর-বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। ভীম সহজেই তাঁহাকে দূর করিয়া দেন। কিন্তু ইহাও বুঝিলেন, রামপাল শীঘ্রই তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবেন এবং হয়ত বহুদিন যুদ্ধ চলিবে। রাজ্যের দক্ষিণে পূর্ব্বসীমা হইতে পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বরাবর তিনি প্রকাণ্ড একটি মাটির প্রাচীর তুলিলেন। দক্ষিণ হইতে শত্রু আসিবার পথে বড় বাধা ত হইবেই; অধিকন্তু লোকের যাতায়াতের সুবিধা হইবে, বর্ষার প্লাবন হইতে গ্রাম ও নগর রক্ষা পাইবে। প্রাচীর নির্ম্মাণ যখন করেন, এ সব দিকেও ভীমের লক্ষ্য ছিল। প্রাচীরের কোনও কোনও অংশ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, এবং লোকে ইহাকে 'ভীমের জাঙ্গাল' বলে।

এই প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ভীমের রাজ্যে প্রবেশ করা সম্ভব হইবে না বুঝিয়া রামপাল তাঁহার সেনা লইয়া বরাবর পশ্চিমের দিকে চলিলেন,

প্রাচীরের শেষ সীমা ঘুরিয়া তবে উত্তর-বাঙ্গালায় প্রবেশ করিবেন। ভীমও তাঁহার সব কৈবর্ত্তসেনা লইয়া সেই দিকে চলিলেন। ঘুরিয়া রামপাল ভীমের রাজ্যে প্রবেশ করিবেন, এমন সময় ভীমের প্রচণ্ড কৈবর্ত্ত সেনা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ভোর বেলায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল,—বৈকাল পর্য্যন্ত সমান ভাবে অবিরত যুদ্ধ চলিল। দুই পক্ষে কত সৈন্য যে মরিল তার সীমাসংখ্যা করা যায় না। প্রকাণ্ড এক হাতীর উপরে থাকিয়া ভীম যুদ্ধ করিতেছিলেন। ভীমকে মারিয়া ফেলা কি বন্দী করা যদি যায়, সহজেই জয় হইবে, তাই রামপালের বড় একদল সেনা ক্রমাগত এই দিকেই তীর ছুঁড়িতেছিল। সহসা ভীম হাতীর উপরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রচণ্ড বেগে ধাইয়া গিয়া রামপালের সেই সেনার দল হাতীটাকে ঘিরিয়া মূর্চ্ছিত ভীমকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

কৈবর্ত্তসেনা অনেকটা ছত্রভঙ্গ হইয়া পিছে হঠিয়া পড়িল। ভীমের বড় অন্তরঙ্গ এক বন্ধু ও সেনাপতি ছিলেন হরি। আর এক দিকে তিনি যুদ্ধ করিতেছিলেন। এই বিপদ দেখিয়া অবিলম্বে তিনি ছুটিয়া আসিলেন। হাঁকিয়া কহিলেন,—"রাজার মহাবিপদ, এসময় তোমরা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছ? পিছু হঠিয়া আসিতেছ? ধিক্ তোমাদের! যুদ্ধে হারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইলে কি গতি তোমাদের শেষে হইবে তাহা ভাবিতেছ না? শক্ত হইয়া দাঁড়াও! আবার সারি বাঁধ! ধাইয়া চল! তোমাদের রাজাকে উদ্ধার কর। কৈবর্ত্তের রাজপাট রক্ষা কর!"

প্রাণে বড় আঘাত পাইয়া কৈবর্ত্তসেনা একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার শক্ত হইয়া সারি বাঁধিয়া হরির সঙ্গে অগ্রসর হইল। কিন্তু রামপালের সেনাদল মধ্যে ঢুকিয়া কৈবর্ত্তসেনাকে তখন দুই ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে। হরি ও তাহার সৈন্যদের তাহারা ঘিরিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর বীর হরিও তাহাদের হাতে বন্দী হইলেন।

তেমন যোগ্য নায়ক তখন আর কেহ থাকিল না। কৈবর্ত্ত সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বরেন্দ্রভূমি রামপালের অধিকারে আসিল।

ইহার পর ভীম ও হরির কি হইল তাহার কোনও স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না! কেহ কেহ অনুমান করেন, বিদ্রোহী বলিয়া দুইজনেরই প্রাণদণ্ড হয়।

(৪)

রামপাল বাঙ্গালার রাজা হইলেন। 'রামাবতী' নামে নূতন একটা নগর গড়িয়া সেই স্থানে তিনি তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। মহীপালের কু-শাসনে এবং এই রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজ্য ভরিয়া বহু বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। যতদূর সম্ভব দূর করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই রামপাল দেশের সুশাসনের একটা ব্যবস্থা করিলেন। তারপর পালরাজবংশের প্রাচীন গৌরব আবার কিসে ফিরিয়া আসিতে পারে সেই দিকে মনোযোগী হইলেন।

বাঙ্গালার পূবের দিকে তিনি একটি পার্ব্বত্য রাজ্য জয় করেন। এই রাজ্যের রাজা মূল্যবান্ বহু উপহার দিয়া রামপালকে সন্তুষ্ট করেন, এবং তাঁহার অধীন সামন্ত হইয়া থাকিবেন বলিয়া স্বীকার করেন। বাঙ্গালার বহুকালের শত্রু কামরূপের রাজাও রামপালের হাতে পরাজিত হইয়া তাঁহার সামন্ত হন।

দক্ষিণে কলিঙ্গ বা উড়িষ্যা দেশে অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ নামে এক রাজা এই সময়ে বড় প্রবল হইয়া ওঠেন। তিনি বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। কিন্তু মহাবীর রামপাল তাহাকে দূর করিয়া দিয়া উড়িষ্যা অধিকার করিলেন। কামরূপ হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত রামপালের রাজ্য বিস্তৃত হইল। একটি পরাক্রান্ত বিরাটরাজ্য রাখিয়া রামপাল বৃদ্ধকালে দেহত্যাগ করেন।

বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন

ভাঙ্গা পালরাজ্য রামপাল আবার অনেক যত্নে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর আর বেশীদিন পালরাজাদের রাজত্ব টিকিল না। প্রজাদের যে বিদ্রোহভাব মহীপালের সময় হইতে দেখা দিয়াছিল, তাহা একেবারে দূর হয় নাই। রামপালের পর তাঁহার পুত্র কুমারপাল রাজা হন। ইহার পর নানারকম বিশৃঙ্খলা আবার দেখা দিল। সামন্তরাও কেহ কেহ স্বাধীন হইয়া দাঁড়াইলেন। অনেক গোলমালের পর সামন্তদের মধ্য হইতে বিজয় সেন নামে এক বীর বাঙ্গালার রাজা হইলেন। ইহার বংশের রাজারা সেনরাজা নামে পরিচিত হন।

পালরাজাদের যখন পতন আরম্ভ হয়, সম্ভবতঃ তখনই এক সময়ে আদিশূর নামে একজন বাঙ্গালায় রাজা হইয়াছিলেন এইরূপ একটি কথা আছে। এই আদিশূর কোন্ বংশের রাজা এবং ঠিক কোন্ সময়ে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসিয়াছিলেন কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। তবে একটি গল্প আছে ; যার জন্য ইহার নাম আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় বিখ্যাত হইয়া আছে। সেই গল্পটি এই :—

পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মই বাঙ্গালায় প্রধান হইয়া ওঠে এবং হিন্দুধর্ম্ম একরকম লোপ পায়। আদিশূর হিন্দু ছিলেন, এবং একটি বিরাট যজ্ঞ সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বাঙ্গালায় এমন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কেহ ছিলেন না, যিনি এই যজ্ঞ করিতে পারেন। তখন কান্যকুব্জে লোক পাঠাইয়া তিনি পাঁচজন সুপণ্ডিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনান এবং ইঁহারা আসিয়া মহাসমারোহে এই যজ্ঞ করেন। এই পাঁচজন বাঙ্গালাদেশেই থাকিয়া যান, এবং হিন্দুধর্ম্মের সব শাস্ত্র ও আচার-

নিয়ম পুনরায় প্রচলিত করেন। ইহার ফলে হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে আবার বাঙ্গালায় প্রবল হইয়া উঠিল এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় লোপ পাইয়া গেল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন কোনও গ্রাম ব্যতীত বৌদ্ধ আর বাঙ্গালায় এখন একরকম দেখাই যায় না।

এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচজন কায়স্থও আসেন। তাঁহারাও বাঙ্গালায় থাকেন। বাঙ্গালার ভাল ভাল বংশের যত ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ, সকলেই প্রায় কনোজী এই পাঁচ ব্রাহ্মণ আর পাঁচ কায়স্থের বংশে জন্মিয়াছেন, এইরূপ প্রবাদও বরাবর এদেশে আছে। আর একটি প্রবাদ আছে, সেনবংশের রাজারা এই আদিশূরের দৌহিত্র বংশ।

বাঙ্গালার প্রথম সেনরাজা বিজয়সেনের পুত্র ছিলেন মহারাজ বল্লাল-সেন। ইহার নাম বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সকলেই জানে। ইনি কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া বাঙ্গালার সমাজ সংস্কার করেন। এবং আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি বড় বড় জাতির সব সমাজ সেই নিয়মে চলিতেছে। নিয়মগুলির মধ্যে কৌলিন্যপ্রথাই সর্ব্বপ্রধান।

তোমরা জান, বাঙ্গালী হিন্দুর এই সব জাতির কতকগুলি বংশকে লোকে কুলীন বলে। যারা কুলীন নয় তাদের বলে অকুলীন বা মৌলিক। বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্মে এই কুলীনরা একটা বিশিষ্ট মর্য্যাদা পান। বিশেষ কতকগুলি গুণের জন্য কয়েকটি বংশকে বাছিয়া বল্লাল সেন এই মর্য্যাদা দেন। বল্লাল সেন রাজা ছিলেন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আর আজ খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দী। সেই অবধি এই আটশত বৎসরকাল এই বংশগুলি বাঙ্গালী সমাজে কুলীন নামে এই মর্য্যাদা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। যাঁহার প্রবর্ত্তিত একটিমাত্র নিয়মে বাঙ্গালার এত বড় একটা সমাজ দীর্ঘকাল চলিয়া আসিতেছে, তাঁহার ক্ষমতা যে কত বড় ছিল তাহা সহজেই তোমরা বুঝিতে পার।

যে কয়টি গুণের ভিত্তির উপর কৌলিন্য মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা নিম্নের এই শ্লোকটিতে তাহাদের উল্লেখ আছে,—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

অর্থাৎ—সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, চরিত্রের খ্যাতি, তীর্থদর্শন, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সাধুবৃত্তি, তপস্যা, এবং দান এই কয়টি হইতেছে, কুল অর্থাৎ উচ্চ কুলের লক্ষণ।

এই লক্ষণ যাঁহাদের ছিল তাঁহারাই হইতেন কুলীন।

(২)

বাঙ্গালায় তখন বিদ্যারও বড় আদর ছিল। বল্লাল সেন ও তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন দুই জনেই নিজেরা বড় পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহাদের রাজসভাতেও পণ্ডিতেরা যথেষ্ট আদর পাইতেন। বাঙ্গালা ভাষা তখনও তেমন গড়িয়া ওঠে নাই। পণ্ডিতেরা সংস্কৃতবিদ্যারই আলোচনা করিতেন এবং সংস্কৃত ভাষাতেই নানারকম পুস্তক লিখিতেন। মহারাজ বল্লাল-সেন 'দানসাগর' নামে বিখ্যাত একখানি পুস্তক লেখেন। লৌকিক ধর্ম্মকর্ম্ম এবং সামাজিক নিয়মকানুন সম্বন্ধে অনেক কথা এই পুস্তকখানিতে লেখা আছে। এইরূপ পুস্তককে এদেশের লোকে স্মৃতি বলে। তারপর 'অদ্ভুতসাগর' নামে জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে একখানি পুস্তক তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু পুস্তকখানি শেষ হইবার আগেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং পণ্ডিতদের সাহায্যে লক্ষ্মণ সেন সে খানিকে সম্পূর্ণ করেন।

মহাকবি জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের একজন সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার সুমধুর কাব্য 'গীতগোবিন্দ' এখনও লোকে বড় আদর করিয়া পড়ে। আগাগোড়া এমন মিষ্ট ঝঙ্কারের কাব্য বড় দেখা যায় না। হলায়ুধ নামে আর একজন পণ্ডিত 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' নামে একখানি পুস্তক

রচনা করেন। ব্রাহ্মণের দৈনিক জীবন কি ভাবে চলিবে, ধর্ম্মের সব ক্রিয়াকর্ম্ম কি ভাবে তাঁহারা নির্ব্বাহ করিবেন, সেই সব কথা এই পুস্তকে লেখা আছে।

এই সময়ে দেশে সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা এবং অন্যান্য নানারকম শিল্পকলারও আশ্চর্য্য রকম উন্নতি হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী-চরিত্রে একটা দোষও দেখা দেয় বাঙ্গালীরা অতিরিক্ত বিলাসী ও আমোদপ্রিয় হইয়া পড়েন। তখনকার অনেক পুস্তকে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে ইহার আভাস পাওয়া যায়। একটা জাতি যখন অতিশয় বিলাসী ও আমোদপ্রিয় হইয়া উঠে, তখন তারা বড় দুর্ব্বল হইয়াও পড়ে। বিপদে ভয় পায়, শক্ত কোনও কাজে মন যায় না, ভাল যুদ্ধও করিতে পারে না। প্রবল রণকুশল কোনও জাতি আসিয়া আক্রমণ করিলে দেশ রক্ষা করা ইহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া ওঠে।

দেশের লোকের মধ্যে এই সব দোষ ক্রটি যতই দেখা যাউক বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন উভয়েই অতি তেজস্বী ও মহাবীর রাজা ছিলেন। লক্ষ্মণের ত কথাই নাই। দেহ যেমন বলিষ্ঠ, অস্ত্রবিদ্যায়ও তিনি তেমনি অতি নিপুণ ছিলেন। প্রথম বয়স হইতেই প্রত্যহ গঙ্গাতীরে গিয়া তিনি ধনুর্ব্বিদ্যা অভ্যাস করিতেন এবং অভ্যাস এমন হইয়াছিল যে, হাতের এক একটি তীর গঙ্গার ওপারে গিয়া পড়িত।

তখনকার একখানি পুস্তকে আছে তাঁহার বাহু দুটি ছিল হাতীর শুঁড়ের মত, বুকের পাটা ছিল শক্ত ও প্রশস্ত একখানি পাথরের মত, আর তাঁহার হাতে বাণের লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হইত না। তাঁহার হাতীগুলি সারি বাঁধিয়া যখন চলিত তখন চারিদিকে থর থর কাঁপিত।

বাঙ্গালারাজ্য যখন নির্ব্বিবাদে অধিকারে আসিল, বল্লাল তখন সুশাসনের জন্য পাঁচটি ভাগে এই রাজ্য বিভক্ত করিয়া এক একটি ভাগ এক একজন শাসনকর্ত্তার হাতে দেন। এই পাঁচটি ভাগের নাম ছিল বঙ্গ,

বাগড়ি, বরেন্দ্র, রাঢ় ও মিথিলা। মিথিলা এখন বিহারের মধ্যে গিয়াছে। বাগড়ি ছিল মধ্যবাঙ্গালা; কিন্তু তার কোনও নাম কি নামের স্মৃতিও এখন নাই। রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গ এই তিনটি নাম ও ভাগ বরাবর আছে, এবং পূর্ব্বে বাঙ্গালার বিবরণে তোমাদের বলিয়াছি, এই তিনটি ভাগ হইতে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজেরই তিনটি নামকরণ হইয়াছে—রাঢ়ী, বারেন্দ্র এবং বঙ্গজ।

মূল রাজ্যের সুশাসনের ব্যবস্থা করিয়া বল্লাল সেন বাঙ্গালার পূর্ব্বকার সাম্রাজ্য আবার গড়িয়া তোলা যায় কিনা, সেই দিকে মন দিলেন। কলিঙ্গ বহুকাল বাঙ্গালার অধীন ছিল, কিন্তু পালরাজাদের পতনের পর আবার স্বাধীন হইয়াছিল।

আগেই তোমরা পড়িয়াছ, রামপালের সময়ে অতি শক্তিশালী হইয়া কলিঙ্গের রাজা অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ বাঙ্গালা আক্রমণও করিয়াছিলেন।

আবার বল বাঁধিয়া কলিঙ্গ বাঙ্গালার বড় শত্রু হইয়া দাঁড়াইতে পারেন, এইরূপ সম্ভাবনা তখন কিছু দেখা গেল। অতি প্রবল হইয়া উঠিবার আগেই বল্লাল সেন কলিঙ্গ আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন।

বলবিক্রমে যুবরাজ লক্ষ্মণের খ্যাতি দেশ দেশান্তরে ব্যপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। অমাত্যসভায় বল্লাল সেন কহিলেন, "কলিঙ্গ যুদ্ধে যুবরাজ লক্ষ্মণকে পাঠাইতে চাই।"

অমাত্যেরা কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন, "যুবরাজ লক্ষ্মণ! তিনি যে তরুণ যুবা মাত্র। এত বড় শত্রুকে দমন করিতে কি পারিবেন?"

রাজা কহিলেন, "যুবার উৎসাহ উদ্যম প্রবীণের অপেক্ষা অনেক বেশী। ক্রীড়ায় যে বলবিক্রম আর অস্ত্রকৌশলের খ্যাতি কুমারের হইয়াছে, যুদ্ধে তার পরীক্ষা হওয়ার সময় এখন আসিয়াছে। কঠিন যুদ্ধেই যোদ্ধার পরীক্ষা ভাল হয়। আপনারা অনুমোদন করুন, কুমারকেই এই যুদ্ধে পাঠাই।"

অমাত্যেরা অনেকেই কহিলেন, "কুমার নিজে যদি সৈন্য ভার নিতে সাহসী হন, আমাদের কোনও আপত্তি নাই, মহারাজ।"

চন্দ্রদেব নামে বৃদ্ধ একজন অমাত্য কেবল কহিলেন, "বয়সে একেবারে তরুণ, তাই ভাবিতেছি মহারাজ, এখনই এত বড় একটা বিপদের মুখে তাঁকে পাঠাইবেন!"

হাসিয়া বল্লাল সেন কহিলেন, "হাঁ, জানি চন্দ্রদেব, কুমার লক্ষ্মণ শৈশব হইতেই আপনার অতি প্রিয়।"

চন্দ্রদেব কহিলেন, "কুমার ত সকলেরই প্রিয় মহারাজ। তবে, হাঁ, অতি স্নেহ করি তাঁহাকে, এই বৃদ্ধের নয়নের মণি কুমার। তাই—ভয় কিছু পাই বই কি? কিন্তু রাজপুত্র যিনি, তাঁহাকে যুদ্ধ করিয়াই এ রাজ্য রক্ষা করিতে হইবে। আর একথাও সত্য বটে, যুদ্ধে না গেলে কেবল খেলায় কেহ যুদ্ধ শেখে না।

"তবে আর আপত্তি কি চন্দ্রদেব?"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া চন্দ্রদেব কহিলেন, "না, মনে কিছু থাকিলেও মুখে আর আপত্তি করিতে পারি কই। তবে একটা কথা ভাবিতেছি। আমাদের এই বাঙ্গালা ত কেহ জয় করিতে আসে নাই। যদি আসে, তখন দরকার হইলে, নারী ও শিশুকেও যুদ্ধ করিতে হয়। আমি যে এই বৃদ্ধ, আমাকেও হয়ত মরিচা ধরা তরোয়ালখানি সাফ করিয়া নিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু পরের রাজ্য জয় করিতে আপনি এই আয়োজন কেন করিতেছেন? আর কুমারকেই বা কেন পর ধনের লোভে এই বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিতেছেন?"

বল্লাল সেন কহিলেন, "এইটিই রাজনীতির বড় একটা নিষ্ঠুর প্রয়োজন চন্দ্রদেব। আজ যদি কলিঙ্গে যুদ্ধ করিতে না যাই, কলিঙ্গ তার সেনা লইয়া কাল বাঙ্গালায় যুদ্ধ করিতে আসিবে। হয়ত বাঙ্গালা তখন অপ্রস্তুত

থাকিবে। আর বাঙ্গালাকে তার শক্তির গৌরবে বড় করিয়া রাখিতে হইলে, পাশের রাজারা ভয়ে যাহাতে তার বাধ্য থাকে, তাহাও করিতে হইবে। কলিঙ্গ আমি অধিকার করিয়া নিজের শাসনে আনিতে চাই না; চাই কলিঙ্গের রাজা আমার অধীন মিত্র হন।"

চন্দ্রদেব কহিলেন, "পাশে ত কেবল কলিঙ্গ নয় মহারাজ, কামরূপ আছে, কাশী আছে, মগধ আছে, ছোট আরও কত রাজ্য আছে।"

"সকলকেই এই ভাবে বাধ্য রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে।"

চন্দ্রদেব কহিলেন, "হায়, কতদিন কেবল এই প্রকার যুদ্ধ করিয়াই রাজাদের শক্তি ক্ষয় করিতে হইবে! সকলে কি মিলিয়া থাকিতে পারেন না? পারিলে কেবল বাঙ্গালার নয়, সকলেরই মঙ্গল হইত। পশ্চিমে তুর্কীরা * বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তারা কেবল আমাদের দেশের নয়, ধর্ম্মেরও বড় শত্রু। গজনীর মামুদ প্রচণ্ড একটা ঝড়ের মত আসিয়া বার বার এই ভারতবর্ষ লণ্ডভণ্ড করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজারা যদি নিজেদের মধ্যে বিবাদ না করিয়া একযোগে দাঁড়াইতে পারিতেন, এত দুর্গতি বুঝি দেশের হইত না।"

বল্লাল সেন কহিলেন,—"সে ঝড়ও ত একশত বৎসরের অধিক হইল কাটিয়া গিয়াছে।"

"আবার আসিবে না কে বলিল? দিব্য চক্ষে আমি দেখিতে পাইতেছি, আসিবে। হায়! এখনও ভারতের রাজারা যদি ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিতেন।"

---

* মুসলমান যে সব জাতি এই সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ ও জয় করেন এদেশের লোকে তাঁহাদের তুর্কী বলিত। জাতিতে অনেকেই ইঁহারা তুর্কী ছিলেন, তাই এই নাম হয়। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় ইঁহাদের যে বাসভূমি তাহাও তুর্কীস্থান ও তুরস্ক নামে পরিচিত।

বল্লাল সেন কহিলেন,—"সকলেই স্বস্বপ্রধান। এ অবস্থায় মিল সহজে হয় না। তবে কেহ যদি আর সকলকে আপনার বাধ্য করিয়া ফেলিতে পারেন, ভারত ভরিয়া বড় একটা সাম্রাজ্য শক্ত করিয়া গড়িয়া লইতে পারেন, তখন সেই সাম্রাজ্যের শক্তি সেই ঝড়েব সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। ঝড় যদি আসে, রক্ষার উপায় এই। আর কোনও উপায় দেখিতে পাই না চন্দ্রদেব।"

"সে সাম্রাজ্য কি কুমার লক্ষ্মণের সাহায্যে আপনি গড়িয়া তুলিতে পারিবেন?"

"জানিনা।—তবে তার চেষ্টা করিতে হইলে আগে চাই পাশের রাজ্যগুলিকে বাধ্য করিয়া লওয়া।"

আর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া চন্দ্রদেব কহিলেন, "বেশ, তবে যুদ্ধই করুন মহারাজ! অন্ততঃ যুদ্ধে যুদ্ধে বিলাসী বাঙ্গালী সজীব ও কর্ম্মঠ হইয়া উঠুক!—কিন্তু কাব্যে সাহিত্যে সঙ্গীতে নৃত্যে আর বসনভূষণ শয্যাদির বিলাসে এত আসক্ত ও সুখপ্রিয় হইয়া ইহারা উঠিয়াছে যে, দুইচারিটা যুদ্ধে কুমার লক্ষ্মণের মত বীরও কঠোর কর্ম্মের ক্লেশে ইহাদিগকে অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।—"

হাসিয়া বল্লাল সেন কহিলেন, "তাহা হইলে আপনার অভিপ্রায় ত দেখিতেছি, অবিরত বাঙ্গালীকে যুদ্ধেই নিযুক্ত রাখা।"

চন্দ্রদেব কহিলেন, "এই রোগ দূর করিবার ঔষধ তাই-ই বটে মহারাজ! তবে এত শত্রুই বা কোথায়? যুদ্ধই বা কি লইয়া হইবে? দুই চারিটা যুদ্ধের পর আপনাদের সুশাসনে দীর্ঘ শান্তি আবার দেশে আসিবে। এই আমোদ প্রমোদে নিশ্চিন্ত হইয়া বাঙ্গালী আবার গা ঢালিয়া দিবে। আর তখন যদি তুর্কীর ঝড় আসে! যাক্, এ বৃদ্ধ তখন থাকিবে না।—যা হয়, হইবে। আপাততঃ বেশ, যুদ্ধই তবে আরম্ভ

হউক। আর কুমার লক্ষ্মণ—হাঁ, তাঁকেই পাঠান মহারাজ! অন্ততঃ তিনিও যদি শক্ত ও কর্ম্মঠ হইয়া ওঠেন, দেশের পক্ষে বড় একটা লাভ হইবে।"

লক্ষ্মণসেনকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি আনন্দে সৈন্যভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।

(৪)

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কলিঙ্গরাজ বল্লালের অধীনতা স্বীকার করিলেন। তখন বন্ধুভাবে কলিঙ্গরাজকে আলিঙ্গন করিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন, "আজ আর শত্রু নই মহারাজ, মিত্র বলিয়া আমাদের মনে করিবেন। কলিঙ্গ অধিকার করিয়া নিজের শাসনাধীন করিবেন এরূপ অভিপ্রায় মহারাজ বল্লালসেনের কখনও ছিল না। আপনার মিত্রতা তিনি চাহিয়াছিলেন; আজ তাহা পাইলেন। ইহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন।"

কলিঙ্গরাজ উত্তর করিলেন, "আপনার বিজিত শত্রু আমি, আজ এই অনুগ্রহে মনেপ্রাণেই আপনার মিত্র হইলাম, কুমার।"

একটু হাসিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন, "এই মিত্রতার তবে একটা পরীক্ষা হউক মহারাজ! আমার ইচ্ছা হয়, কলিঙ্গে কিছুদিন থাকি, এবং যুদ্ধের ক্লান্তির পরে উৎসব আনন্দে মিলিয়া মিশিয়া আপনার প্রজাদের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় করি। এই উপলক্ষে দেশটাও ভাল করিয়া দেখিব আর শিখিবার যাহা আছে, তাহাও শিখিব।"

কলিঙ্গরাজ উত্তর করিলেন, "প্রজারা এই যুদ্ধের মধ্যেও আপনার সৌজন্যের পরিচয় পাইয়াছে। এখন তারা আজ আপনাকে মিত্রভাবে পাইলে বড় সুখী হইবে। কেবল মিত্রতার পরীক্ষা নয়, বন্ধনও ইহাতে অনেক দৃঢ় হইবে। চলুন তবে কুমার, কলিঙ্গের রাজধানী আপনার সম্বর্দ্ধনা করিয়া কৃতার্থ হইবে।"

বহু হাতী ঘোড়া আর সৈন্যসজ্জার শোভাযাত্রা করিয়া লক্ষ্মণসেনকে লইয়া কলিঙ্গরাজ রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। যেন কোন বিজয়ী রাজা আপন রাজধানীতে ফিরিয়াছেন, এমন ভাবে কিছুকাল উৎসব আনন্দ সেখানে চলিল। সর্ব্বপ্রকার রাজকীয় আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণসেন সরল-ভাবে সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। মল্লবিদ্যার ও অস্ত্রবিদ্যার খেলাও দেখাইতেন। উৎসবের কাল শেষ হইলে, কখনও অমাত্যদের সঙ্গে রাজনীতির আলোচনায়, কখনও পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনায় তিনি অনেক সময় কাটাইতেন। তারপর কিছুদিন নানাস্থানে ঘুরিয়া দেশটি বেশ করিয়া দেখিয়া লইলেন। জগন্নাথক্ষেত্রে এই সময়ে তিনি একটি জয়স্তম্ভও প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েকজন সহচর মাত্র সঙ্গে রাখিয়া বাঙ্গালী সেনার দলটিকে তিনি আগেই দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বহু আপ্যায়নে সকলকে তুষ্ট করিয়া, কলিঙ্গবাসীদের আপ্যায়নেও নিজে পরিতৃপ্ত হইয়া, এই সহচরদের সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মণসেন শেষে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন ছিলেন শান্তশীল।

সীমান্ত পার হইয়া যখন বাঙ্গালায় প্রবেশ করিলেন, এই শান্তশীল তখন কহিলেন, "আজ নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইলাম, কুমার!"

লক্ষ্মণসেন কহিলেন, "কেন, চিন্তার ও ভয়ের কি কারণ তোমার হইয়াছিল, শান্তশীল?"

"বলেন কি কুমার! হাজার হইলেও বিজিত শত্রুর রাজ্য ত? কয়েকটি সহচর মাত্র আমরা সঙ্গে—"

"কিন্তু, সেই তোমাদের পিছনে সমস্ত বাঙ্গালা যে রহিয়াছে শান্তশীল! দুরভিসন্ধি মনে কিছু থাকিলেও কলিঙ্গরাজের সাধ্য কি যে আমার কোন অনিষ্ট করেন? কেবল তোমাদের কয়জনের ভরসা করিয়া নয়, বিজয়ী এই বাঙ্গালার ভরসা করিয়াই আমি কলিঙ্গে ছিলাম।

আর কি জান শান্তশীল? শাস্ত্র আলোচনাও কিছু করিয়াছি,—নিয়তিকে আমি মানি। অকালে আততায়ীর হাতে মৃত্যু যদি আমার ভাগ্যে থাকে, কেহই তাহা খণ্ডাইতে পারিবে না। ভয় নাই, শান্তশীল, শীঘ্র আমি মরিব না। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন অতি দীর্ঘ আয়ু আমি পাইব।"

"পণ্ডিতদের কথা সত্য হউক, কুমার!"

কয়েকজনে একসঙ্গে এই কথা বলিয়া উঠিলেন।

একটু গম্ভীর হইয়া লক্ষ্মণ কহিলেন,—"সত্য না হইলেই ভাল হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই অতি বৃদ্ধকালে বড় একটা দুর্ভাগ্যেরও আভাস ইহারা দিয়াছেন।"

"কি সে দুর্ভাগ্য, কুমার?"

"না, সে কথা কিছু বলিব না। আভাস যাহা পাইয়াছি, তা যদি সত্য হয়, তবে তার চেয়ে আজ এই প্রথম যৌবনে কলিঙ্গের কোন আততায়ীর হাতে মৃত্যুও আমার সৌভাগ্যের কথা হইত। দীর্ঘজীবন লোকে কামনা করে। কিন্তু বৃদ্ধ, স্থবির ও দুর্ব্বল হইলে মানুষের বহু দুর্গতিও হয়। তার চেয়ে সতেজ ও সবল অবস্থায় পৌরুষের পূর্ণ গৌরবের মধ্যে যার জীবনের অবসান হয়, সেই প্রকৃত ভাগ্যবান্!"

(৫)

আরও কয়েক বৎসর গেল। বল্লাল তখন বৃদ্ধ ও রুগ্ন। সংবাদ আসিল/কামরূপের রাজা বাঙ্গালা আক্রমণের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু মহারাজ বল্লালের তখন মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিতে হইল।

একটু অবসর হইলেই মহারাজ লক্ষ্মণসেন কামরূপ আক্রমণ করিলেন। রাজা রাযারি দেব পরাজিত হইয়া বাঙ্গালার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

কামরূপের পূর্ব্ব-দক্ষিণে ভারতের সীমার বাহিরে পূর্ব্ব-উপদ্বীপে আরাকান্ দেশের কথা তোমরা জান। ব্রহ্মদেশের একটা অংশের মত এই আরাকান্, এবং এই সব অঞ্চলের লোকেরা মগ নামে পরিচিত। এই সময়ে গলয় নামে এক মগ রাজা বড় প্রবল হইয়া ওঠেন, এবং বাঙ্গালার দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগ আক্রমণ করেন। লুঠপাট করিতে করিতে কিছুদূর মগেরা অগ্রসর হইতেই বাঙ্গালার সেনা লইয়া লক্ষ্মণসেন গিয়া বাধা দিলেন। কিছুদিন যুদ্ধের পর সীমান্তের বাহিরে ইহাদের দূর করিয়া দিয়া সীমান্ত প্রদেশের রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া আসিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল নবদ্বীপে। সেখান হইতে বাঙ্গালার দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমার পার্ব্বত্য অঞ্চল অনেক দূরে এবং বড় বড় নদীও অনেক পার হইয়া যাইতে হয়। সমুদ্রও ইহার অতি নিকটে এবং আরাকানীরা সমুদ্রপথেই জাহাজে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল। জলে ও স্থলে দুই স্থানেই এই যুদ্ধ হয়। এবং পরে দেশ রক্ষার জন্য স্থলভাগে দুর্গ নির্ম্মাণ এবং জলভাগে নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা করিতে হয়।

মগধের উত্তরে মিথিলা। এই মিথিলা ছিল সেনরাজাদের অধীন বাঙ্গালা রাজ্যের একটি প্রদেশ। অঙ্গ বা ভাগলপুর অঞ্চলে পালবংশের ছোট এক রাজা তখন রাজত্ব করিতেন। আর পশ্চিমে কাশীর রাজা ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র দেব। কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মিথিলা, কাশী আর অঙ্গ এই তিনটি রাজ্যের মধ্যে পড়িয়া মগধ বড় বিপন্ন আর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ এই তিন দিক হইতেই মগধের তিন সীমান্তে অনেক বিবাদ বিসম্বাদ—কখন কখন যুদ্ধও হইত। কাশীরাজ গোবিন্দচন্দ্র দেব এই সময়ে মগধ আক্রমণ করেন। মগধ জয় করিতে পারিলে রাজা গোবিন্দচন্দ্র দেবের রাজ্য একেবারে বাঙ্গালার সীমা পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িবে। তাই লক্ষ্মণসেনও বৃহৎ একদল বাঙ্গালী সেনা লইয়া

মিথিলার মধ্য দিয়া গিয়া মগধে প্রবেশ করিলেন। পরাজিত হইয়া গোবিন্দচন্দ্র দেব মগধ হইতে সরিয়া গেলেন। বিজয়ী লক্ষ্মণসেন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কাশী পর্য্যন্ত গিয়া পড়িলেন। গোবিন্দচন্দ্র দেব নিজে কাশী ছাড়িয়া গেলেও কাশীর প্রজারা লক্ষ্মণসেনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। কিছুদিন ভীষণ যুদ্ধের পর শেষে তাহারা বশীভূত হইল। জয়লাভের পর সদয় ও মিষ্ট ব্যবহারে কাশীবাসীদের সন্তুষ্ট করিয়া কিছুকাল লক্ষ্মণসেন এখানে থাকেন। কয়েকটি জয়স্তম্ভও সেখানে স্থাপন করেন। এই সব স্তম্ভের গায়ে কাশীজয়ের আর কাশীতে তাঁহার শাসনমহিমার কথা ক্ষোদিত করিয়া রাখা হয়। পূর্ব্বে জগন্নাথক্ষেত্রেও তিনি একটি জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। দক্ষিণ বাঙ্গালায়, মিথিলায় এবং কামরূপ অঞ্চলেও লক্ষ্মণসেনের এইরূপ অনেক স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। যুদ্ধে তাঁহার বীরত্বগৌরব এবং শাসনে রাজত্বগৌরবের অনেক কথাই এই সব স্তম্ভের ক্ষোদিত লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি।

(৬)

ইহার পর দীর্ঘ কাল শান্তিতে লক্ষ্মণসেন রাজত্ব করেন। বিলাসী হইয়া উঠিলেও এই সকল যুদ্ধ যতদিন চলিয়াছে, বাঙ্গালীরা তেজের সহিতই যুঝিয়াছে। সকল যুদ্ধেই জয়ী হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের পর দীর্ঘ এই শান্তিতে আবার তাহারা বড় বিলাসী হইয়া উঠিল। আগের যোদ্ধারা সব মরিয়া গেলে তাঁহাদের সন্তান সন্ততি যাঁহারা এই সময়ে বড় হইয়া ওঠেন, খেলায় ছাড়া যুদ্ধে বড় একটা অস্ত্র চালনা তাঁহাদের করিতে হয় নাই। যুদ্ধের অভ্যাসই বাঙ্গালীর মধ্যে তেমন রহিল না। ব্যবসায় বাণিজ্যে ধনের অভাব দেশে ছিল না। কাব্য সঙ্গীত আর শিল্পকলারও অবিরত

চর্চ্চা সর্ব্বত্র হইত। এই সব লইয়া আমোদ প্রমোদেই বাঙ্গালীরা জীবনের বেশী ভাগ কাটাইতেন। যে সঞ্জীবতা আর কঠিন কর্ম্মশক্তি লক্ষ্মণসেনের বীরবিক্রমে বাঙ্গালায় জাগিয়া উঠিয়াছিল, ক্রমে আবার তাহা অবসন্ন হইয়া পড়িল। লক্ষ্মণসেন নিজেও, অতি বৃদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শত্রু নাই, যুদ্ধবিগ্রহ নাই, সুব্যবস্থায় অমাত্যেরা রাজ্যও সুশাসনে রাখিয়াছেন। শাস্ত্র আলোচনায় আর ধর্ম্ম অনুষ্ঠানেই তিনি অধিকাংশ কাল কাটাইতেন। তবে বার্দ্ধক্যে যে দুর্ভাগ্যের কথা জ্যোতিষীরা তাঁহার প্রথম যৌবনে বলিয়াছিলেন, সে কথাও মনে পড়িত; আর তখন বড় একটা অশান্তিও বোধ করিতেন। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী শান্তি আর সুশাসনের শৃঙ্খলায় নিশ্চিন্ত হইয়া কাব্য সঙ্গীতের চর্চ্চায় আর ভোগ-বিলাসে বাঙ্গালী যেরূপ মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ইহার প্রতিকারের উপায় যে কি হইতে পারে তাহাও ভাবিয়া পাইতেন না। অবস্থার সুবিধা পাইয়া স্বভাবতঃ এই বিলাসিতার স্রোত যখন একটা দেশকে প্লাবিত করে, তখন তাহার প্রতিরোধ করা সহজ নয়। আবার নিয়তিতে প্রথম বয়স হইতেই তাঁহার একটা গভীর বিশ্বাস ছিল। একথাও মনে হইত, এই দুর্ভাগ্যই যদি নিয়তি হয়, কেহ তাহা খণ্ডাইতে পারিবে না।

আগেই তোমরা পড়িয়াছ, তুর্কী আক্রমণের একটা ঝড় আসিবে, বল্লালসেনের এক অমাত্য চন্দ্রদেব এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই ঝড় লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষভাগে ভারতের পশ্চিম আকাশে উঠিল।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গজনীর মুসলমান সুলতান মামুদ পঞ্জাব জয় করেন। গজনী রাজ্য ছিল সিন্ধু নদীর পশ্চিমে আফগানিস্থানের মধ্যে। ইহার দক্ষিণে আর একটি মুসলমান রাজ্য ছিল ঘোর। ঘোরের রাজা অতি প্রবল হইয়া এই সময়ে গজনী ও তার সঙ্গে পঞ্জাব জয় করিয়া লয়েন। এই রাজার

এক ভাই ছিলেন মহাবীর সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী। ভারতবর্ষ জয় করিয়া মুসলমান সাম্রাজ্যের বিস্তার করিবেন, ইহাই হইল তাঁহার জীবনের ব্রত। পঞ্জাবের পূর্ব্বেই দিল্লী রাজ্য। রাজা ছিলেন মহাবীর পৃথ্বীরাজ। দিল্লীর পূর্ব্বেই কনোজ রাজ্য; রাজা ছিলেন পৃথ্বীরাজের পরম শত্রু জয়চন্দ্র। তার পরে মগধ আর বাঙ্গালা। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী দিল্লী আক্রমণ করেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজের বিক্রমে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া যান। দুই বৎসর পরে আবার তিনি আসিয়া দিল্লী আক্রমণ করেন। তাঁহার চতুরতা ও কৌশলে এবার পৃথ্বীরাজই পরাজিত হইলেন। বন্দী পৃথ্বীরাজকে হত্যা করিয়া সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করিলেন। কনোজের জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের পক্ষে না দাঁড়াইয়া বরং তাঁহার বিপক্ষে মহম্মদ ঘোরীরই সাহায্য করেন। পর বৎসর মহম্মদ ঘোরী কনোজরাজ্যও জয় করিয়া লইলেন। কয়েক বৎসর পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বক্তিয়ার খিলিজি নামে মহম্মদ ঘোরীর একজন মহাবীর সেনাপতি মগধ জয় করেন। তারপর বাঙ্গালা আক্রমণ করেন।

লক্ষ্মণসেনের বয়স তখন আশী বৎসরের উপরে হইয়াছে। তাঁহার দুই পুত্র কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ করিতেছিলেন। বাঙ্গালীর তখন এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, তাহাদের লইয়া প্রবল এই তুর্কী আক্রমণের গতিরোধ করা অসম্ভব বলিয়া লক্ষ্মণের মনে হইল। জ্যোতিষীদের কথা এইবার ফলিতে চলিল—ভিন্নধর্ম্মী বিদেশীদের আক্রমণে তাঁহাকে রাজ্যহারা হইতে হইবে—ইহার অপেক্ষা দারুণতর দুর্ভাগ্য আর কি আছে? তাঁহার মনও বড় দমিয়া গেল।

গোড়াতে বাঙ্গালার বিবরণে তোমাদিগকে বলিয়াছি, উত্তর ও পশ্চিম বাঙ্গালায় গৌড় ও নবদ্বীপ এবং পূর্ব্ববাঙ্গালায় রামপাল এই তিনটি

রাজধানী সেনরাজাদের ছিল। লক্ষ্মণসেন তখন নবদ্বীপে ছিলেন। গৌড় ও নবদ্বীপ রক্ষা করিতে পারিবেন না বুঝিয়া লক্ষ্মণসেন রামপালে চলিয়া আসিলেন।

এই দুইটি রাজধানীর সহিত বাঙ্গালার এই ভাগ মুসলমান তুর্কীদের অধিকারে আসিল। এই সব ঘটনার ঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে নানা অবস্থা হইতে এইরূপ কি ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বক্তিয়ার খিলিজি যে নবদ্বীপ (মুসলমানী ভাষায় 'নোদিয়া') অধিকার করেন, তার সম্বন্ধে অদ্ভুত একটি গল্প আছে। মাত্র সতের জন ঘোড়-সোওয়ার লইয়া তিনি নাকি রাজধানী নবদ্বীপে প্রবেশ করেন।* লোকে মনে করিল, বিদেশী বণিক্ কাহারা ঘোড়া বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। কেহ কিছু বলিল না; কৌতুকে কেবল চাহিয়া দেখিল। সতের জন ঘোড়সোওয়ার বরাবর রাজপ্রাসাদের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন তরোয়াল বাহির করিয়া দ্বারপাল যাহারা ছিল তাহাদের কাটিয়া ফেলিল, এবং ভিতরে গিয়া ঢুকিল। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন কেবল আহারে বসিয়াছেন। একটা রব উঠিল, তুর্কীরা আসিয়া পুরী দখল করিয়াছে। ভয়ে লক্ষ্মণসেন তখনই উঠিয়া রাণীর হাত ধরিয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইলেন। কাছেই গঙ্গাতীরে একখানি নৌকা ছিল, নৌকায় চড়িয়া পলাইয়া গেলেন। রাজধানীর লোকেরাও সব ভয়ে চুপ করিয়া রহিল। বক্তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপ অধিকার করিয়া ফেলিলেন।

ইহার চেয়ে অসম্ভব কথা আর কি হইতে পারে? এতদিনের এত বড় রাজ্য, আর লোকে পরিপূর্ণ তার রাজধানী। রাজধানীতে রাজার সেনা, নগররক্ষী, এসবও ছিল। সতের জন বিদেশী সৈনিক আসিল, আর নির্ব্বিবাদে সেই রাজধানী দখল করিয়া লইল, নগরবাসীরা নীরবে তাহাদের অধীন হইল, সৈন্যেরা, নগররক্ষীরা হাতে একটিবার তরোয়ালও তুলিয়া ধরিল

না,—রাজা আহারে বসিয়াছেন—শুনিয়াই অমনই পলাইয়া গেলেন,—কোনও রূপকথায়ও এমন একটা গল্প শোনা যায় না। আর ইহা একেবারেই সম্ভব নয় যে মাত্র সতের জন লোক লইয়া বক্তিয়ার অতবড় একটা রাজ্যের রাজধানীতে প্রবেশ করিতে সাহস করিবেন। দেশ জয় করিতে তিনি বাহির হইয়াছেন, সেনাও সঙ্গে ছিল। তা সব দূরে রাখিয়া মাত্র এই কয়েকটি লোক লইয়া শত্রুর পুরীতে পাগলেও প্রবেশ করে না।

পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, এইমাত্র হইতে পারে যে, নবদ্বীপ ও তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল রক্ষা করা সম্ভব নয় বুঝিয়া, সৈন্য সামন্ত ও সব লোক-জনী লইয়া লক্ষ্মণসেন আগেই রামপাল নগরে চলিয়া যান। সংবাদ পাইয়া বক্তিয়ার খিলিজির ছোট একদল অগ্রগামী সেনা আসিয়া শূন্য নগর দখল করে।

এই রামপালে ইহার পরও সেনবংশের হিন্দু রাজারা অনেককাল রাজত্ব-করেন। গৌড় ও নবদ্বীপ জয়ের পরে এই পূর্ব্ব-বাঙ্গালা জয় করিয়া লইতে মুসলমানদের দেড় শত বৎসরের বেশী লাগিয়াছিল। এত বৎসর যুঝিয়া যাহারা দেশের অর্দ্ধেক ভাগ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহাদের রাজধানী মাত্র সতের জন লোক আসিয়া দখল করিয়া লইল, আর সকলে চুপ করিয়া রহিল, এমন হইতেই পারে না।

আরও বিবেচনার কথা আছে। পশ্চিম বাঙ্গালা জয় করিবার পরে বক্তিয়ার খিলিজি কামরূপ আক্রমণ করেন। পূর্ব্ববাঙ্গালা জয় না করিয়া আগে যে তিনি কামরূপ আক্রমণ করেন, ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, কিছু চেষ্টা করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন তাহা সম্ভব হইবে না। আবার কামরূপ হইতে পরাজিত হইয়াও তাঁহাকে ফিরিতে হয়। এই কামরূপ কিছুকাল আগে যুদ্ধে হারিয়া বাঙ্গালার লক্ষ্মণসেনের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।

তাই মনে হয়, কোনও একটি যুদ্ধে হারিয়া অথবা বিশাল রাজ্য রক্ষাকরা সম্ভব হইবে না বুঝিয়া পশ্চিম বাঙ্গালা ছাড়িয়া লক্ষ্মণসেন পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সরিয়া যান। প্রবল কোনও শত্রু দেশ আক্রমণ করিলে একভাগ ছাড়িয়া দিয়া অন্য ভাগে গিয়া শক্ত হইয়া দাঁড়ানর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক আছে। এইভাবে একভাগে গিয়া দাঁড়াইয়া শত্রুর বিজিত রাজ্য আবার জয় করিয়া লইবার চেষ্টাও অনেক রাজা অনেক দেশে করিয়াছেন। কেহ পারিয়াছেন, কেহ পারেন নাই। বিপদে রাজনীতির বড় একটি কৌশল বলিয়াও অনেকে ইহা মনে করেন।

তবে এমন একটা গল্প কোথা হইতে আসিল ? তাহারও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। গৌড়-নবদ্বীপ জয়ের ৪০।৫০ বৎসর পরে মিন্‌হাজ উদ্দিন নামে একজন মুসলমান ঐতিহাসিক বাঙ্গালায় আসেন। বক্তিয়ার খিলিজির সময়-কার বৃদ্ধ একজন মুসলমান সৈনিক এই গল্পটি তখন তাঁহার কাছে করিয়া-ছিল। মিন্‌হাজ এই গল্পটি তাঁহার ঐতিহাসিক বিবরণে লিখিয়া রাখেন ; ইহাও বলেন, আমি এই গল্পটি যেমন শুনিয়াছি ঠিক তেমনই লিখিয়া রাখিলাম।

প্রথমে যাঁহারা ভারতবর্ষের মুসলমান আমলের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন, সম্ভব অসম্ভব কিছু বিচার না করিয়া মিন্‌হাজের পুস্তকের এই গল্পটি তাঁহাদের ইতিহাসের মধ্যে আনিয়াছেন। তারপর সকলেই সকল ইতিহাসে সত্য ঘটনার ন্যায় এই কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন।

এই ভাবে বাঙ্গালার বীর রাজা লক্ষ্মণসেন আর বাঙ্গালী জাতির নামে এই কলঙ্ক এ যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীরা তখন বিলাসী ও অনেকটা দুর্ব্বল হইয়াছিল এবং তার ফলে নূতন বলীয়ান্ জাতি মুসলমানের কাছে যুদ্ধেও হারিতে পারে। কিন্তু মাত্র সতের জন বিদেশী আসিল আর দেশটা দখল করিয়া ফেলিল, বহুশত বৎসরের স্বাধীন ও উন্নত কোনও জাতির এমন দুর্গতি হইতে পারে না।

সামসুদ্দিন ইলিয়াস্ সাহ

(১)

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ সাহাবুদ্দিন ঘোরী পৃথ্বীরাজের দিল্লীরাজ্য জয় করেন। তারপর ১০।১১ বৎসরের মধ্যে দিল্লী হইতে পশ্চিম বাঙ্গালা পর্য্যন্ত উত্তর ভারতের প্রধান দেশগুলি প্রায় সবই আফগানী মুসলমান ঘোররাজ্যের অধীন হয়। দিল্লীতেই রাজধানী করিয়া মহম্মদ সাহাবুদ্দিন ঘোরী কুতুবুদ্দিন আইবেক নামক একজন সেনাপতিকে ভারতের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান।

এই সময় হইতে ভারতে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। এই যুগ মুসলমান শাসনের যুগ বা মুসলমান আমল।

১২০৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ সাহাবুদ্দিন ঘোরীর মৃত্যু হয়। তখন কুতুবুদ্দিন আইবেক ভারতের স্বাধীন রাজা হইলেন। খুব বড় কোনও মুসলমান রাজাকে সুলতান বলে। সুলতান আরবী ভাষার কথা। এই অঞ্চলের মুসলমানদের প্রধান ভাষা ছিল পারসী। পারসী ভষায় রাজাকে বলে শাহ, এবং কোনও রাজা খুব বড় অর্থাৎ সম্রাটের মত হইলে তাঁহাকে বলে বাদশাহ।

উত্তর ভারতে এই যে মুসলমান সাম্রাজ্য হইল, কুতুবুদ্দিন হইলেন তার প্রথম সম্রাট্। তাঁহারও নাম হইল সুলতান্। পরে এই সম্রাট্দের লোকে বাদসাহ বলিতেও আরম্ভ করিল। এই সময়ে মুসলমান যাঁহারা ভারতে আসেন, তাঁহারা জাতিতে ছিলেন কতক তুর্কী কতক আফগান

বা পাঠান *। ভারতের হিন্দুরা ইঁহাদের সকলকেই তখন তুর্কী বলিতেন। কিন্তু ইতিহাসে ইঁহারা পাঠান নামেই পরিচিত হইয়াছেন।

কুতুবুদ্দিন যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, সাধারণতঃ লোকে তাহাকে পাঠান সাম্রাজ্যই বলে। পরপর কতকগুলি রাজবংশ ১২০৬ হইতে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীতে রাজত্ব করেন। সকলেই জাতিতে ঠিক পাঠান না হইলেও, ইতিহাসে পাঠান রাজবংশ নামেই ইঁহাদের পরিচয় আছে। দিল্লী রাজধানী ছিল বলিয়া এই সাম্রাজ্যকে অনেকে আবার দিল্লীর পাঠান সুলতানী বা পাঠান বাদসাহীও বলেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর সাহ নামে বড় একজন তুর্কী বীর দিল্লী জয় করিয়া ভারতের সম্রাট্ হন। মোগল নামেও বড় একটা মুসলমান জাতি তখন মধ্য এসিয়ায় ছিল। বাবরের পিতা ছিলেন তুর্কী, কিন্তু মাতা ছিলেন এক মোগল রাজকন্যা। পিতা হইতেই বংশের পরিচয় হয়, মাতা হইতে নয়। সুতরাং বাবর তুর্কীই ছিলেন, এবং নিজেও আপনাকে তুর্কী বলিতেন। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে বাবরসাহ মোগলনামেই এদেশে পরিচিত হন। বাবরের বংশের সম্রাট্দেরও সকলে মোগল সম্রাট্ বা মোগল বাদসাহ বলে, এবং তাঁহাদের এই সাম্রাজ্যের নাম হয় মোগলসাম্রাজ্য বা মোগল বাদসাহী। এই 'বাদসাহ' নামটা মোগলদের আমলেই প্রচলিত হয় বেশী। পাঠান সম্রাট্রা সাধারণতঃ আপনাদের সুলতানই বলিতেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এই ইংরাজ আমল পর্য্যন্ত যে মুসলমান সাম্রাজ্য ভারতে ছিল, তাহা এই বাবর-

---

* ইঁহাদের নাম হইতেই সিন্ধুনদীর ওপারে উত্তর ভাগের দেশটির নাম হইয়াছে আফগানিস্থান। ইহার দক্ষিণে বেলুচি নামে আর একটি জাতির দেশ, এই দেশটির নাম বেলুচিস্থান। আফগানদেরই আর একটি নাম পাঠান। কেহ কেহ বলেন, ইহাদের ভাষা 'পুষ্টু' হইতে এই পাঠান নাম হইয়াছে।

বংশের মোগলসাম্রাজ্য। আকবর, জাহাঙ্গীর, সাহজাহান, ঔরঙ্গজেব এই সব বড় বড় সাম্রাট্‌রা সকলেই ছিলেন বাবরবংশের মোগল সম্রাট্। ইঁহাদের নাম তোমরা সকলেই জান। মহম্মদ ঘোরী মাত্র উত্তর ভারতের কয়েকটি দেশ জয় করেন। পাঠান ও মোগল সম্রাট্‌দের রাজত্বকালে ক্রমে ভারতবর্ষের বহু অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে আসে।

পশ্চিম ও মধ্য এসিয়া হইতে পাঠান, মোগল, তুর্কী প্রভৃতি অনেক জাতির অনেক মুসলমান এই সময়ে ভারতবর্ষে আসেন। কেহ রাজা, কেহ রাজকর্ম্মচারী, কেহ জমিদার, কেহ বা বণিক্ হইয়া এদেশেই ইঁহারা থাকিয়া যান এবং এই দেশেরই অধিবাসী হইয়া দাঁড়ান। মুসলমানরা মনে করিতেন, মুসলমানধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, এবং পৃথিবীর সকল লোকেরই মুসলমান হওয়া উচিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরব দেশে এই ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। তার পর একশত বৎসরে মুসলমানরা এদিকে পশ্চিম ও মধ্য এসিয়ার এবং ওদিকে আফ্রিকার অনেক দেশ জয় করেন। এই সব দেশে তাঁহারা রাজ্য স্থাপন করিয়া শাসন করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ধর্ম্মও প্রচার করিতেন। প্রথম দুই এক শত বৎসরের মধ্যেই এই সব দেশের লোক প্রায় সবই মুসলমান হইয়া যায়।

ভারতবর্ষ অধিকার করিবার পর এখানেও মুসলমানরা তাহাদের ধর্ম্ম প্রচারের জন্য চেষ্টা করেন এবং অনেক হিন্দু তাহার ফলে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এইভাবে মুসলমান আমলে ভারতবর্ষে বড় একটা মুসলমান সমাজও গড়িয়া উঠিল। এই সমাজের লোকদের কতক ভারতের বাহির হইতে আগত মুসলমানদের বংশধর, আর কতক ধর্ম্মত্যাগী হিন্দু। মুসলমান সমাজের লোক ইঁহারাই বেশী।

প্রথম যখন মুসলমান আমল আরম্ভ হয়, তখন বিজয়ী মুসলমান রাজারা পরাজিত ও অধীন জাতি বলিয়া হিন্দুদের বড় অবজ্ঞা করিতেন, অত্যাচারও

কখনও কখনও হইত। ক্রমে এ ভাবটা দূর হয় এবং ধর্ম্ম ও সমাজ পৃথক্ হইলেও একই ভারতের অধিবাসী বলিয়া ইহাদের মধ্যে অনেকটা আত্মীয় ভাব দেখা দেয়। ভারতের বেশী ভাগ মুসলমান-রাজাদের অধিকারে আসিলেও স্বাধীন হিন্দুরাজ্যও মধ্যে মধ্যে ছিল। আবার মুসলমান রাজ্যের মধ্যেও হিন্দু সামন্ত রাজা, জায়গীরদার, জমিদার অনেক ছিলেন। বড় বড় রাজকার্য্যেও হিন্দুরা নিযুক্ত হইতেন। দিল্লীর সম্রাট্‌রা ছিলেন মুসলমান, বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহাদের শাসনকর্ত্তারাও ছিলেন প্রায় সকলে মুসলমান। এই শাসনকর্ত্তারা আবার এক এক প্রদেশ অনেকটা রাজার মতই শাসন করিতেন। দিল্লীর সম্রাট্‌কে নিয়ম মত করের টাকা পাঠাইয়া দিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন; শাসনকার্য্যে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতেন না। এক একজন শাসনকর্ত্তার পরে তাঁহার বংশধরেরাই সেই প্রদেশের শাসনকার্য্য করিতেন এবং সেই প্রদেশেরই স্থায়ী অধিবাসী হইয়া দাঁড়াইতেন। সুযোগ পাইলে কর বন্ধ করিয়া দিয়া ইঁহারা কেহ কেহ একেবারে স্বাধীন রাজাও হইতেন।

প্রত্যেক প্রদেশে আবার ইঁহাদের অধীনে অনেক জায়গীরদার ও জমিদার ছিলেন। প্রায় রাজার মতই তাঁহারা একটি একটি অঞ্চল শাসন করিতেন, আর বেশীর ভাগই ছিলেন হিন্দু। এই সব অবস্থা হইতে তোমরা বেশ বুঝিতে পারিবে, হিন্দুরা অনেক পরিমাণে মুসলমান রাজাদের অধীন হইয়া থাকিলেও ভারতবর্ষ পরাধীন হয় নাই। কারণ, এই মুসলমান রাজারা ছিলেন ভারতেরই অধিবাসী, আর এই সব মুসলমান রাজাদের রাজ্যের মধ্যে হিন্দু জমিদার বা ছোট রাজাদের শক্তিপ্রতিপত্তিও বড় কম ছিল না। মুসলমান রাজারা যুদ্ধে ও রাজ্যশাসনে হিন্দুদের উপরে অনেক নির্ভরও করিতেন। হিন্দুরাও আপনাদেরই দেশের রাজার ন্যায় ইহাদের সহায়তা করিতেন। কোনও কোনও মুসলমান রাজা কি শাসনকর্ত্তা

ভিন্নধর্ম্মী বলিয়া হিন্দুদের কিছু চাপিয়া রাখিতে চাহিতেন, অত্যাচারও কিছু কিছু করিতেন। আবার অনেকে হিন্দু ও মুসলমান প্রজা সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন, সমান নিয়মে শাসন করিতেন।

(২)

লক্ষ্মণসেনের পর আমাদের এই বাঙ্গালাও হইল দিল্লীর পাঠান সাম্রাজ্যের অধীন একটি প্রদেশ, এবং পাঠান শাসনকর্ত্তারা বাঙ্গালায় থাকিয়া বাঙ্গালা শাসন করিতেন। এই শাসনকর্ত্তাদের এবং আরও অনেক বড় বড় মুসলমান নায়কদের বংশ বাঙ্গালায় থাকিয়া বাঙ্গালী হইয়া ওঠেন। তাছাড়া, বাঙ্গালার অনেক হিন্দুজাতিও মুসলমান হয়। এইভাবে ক্রমে অর্দ্ধেক বাঙ্গালী মুসলমান হইয়া ওঠে।

বক্তিয়ার খিলিজিই ছিলেন বাঙ্গালার প্রথম শাসনকর্ত্তা। বাঙ্গালার পশ্চিমভাগ তিনি জয় করিয়াছিলেন। প্রাচীন গৌড় নগরে তিনি রাজধানী করেন। তারপর শাসনের সুবিধার জন্য পূবের দিকে দিনাজপুর অঞ্চলে দেবকোট নামে আরও একটি রাজধানী তিনি করিলেন। ইহার পূবে লক্ষ্মণসেনের বংশধর সেনরাজারা রাজত্ব করিতেন, এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইঁহাদের রাজধানী ছিল রামপালে। প্রায় দেড়শত বৎসর দিল্লীর অধীন শাসনকর্ত্তারা বাঙ্গালা শাসন করেন এবং এই সময়ের মধ্যেই তাঁহারা পূর্ব্ব বাঙ্গালার হিন্দু রাজ্য জয় করিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মহম্মদ তোগলক ছিলেন দিল্লীর সুলতান। ইনি বড় খামখেয়ালী রাজা ছিলেন, আর প্রজাদের উপরে সময়ে সময়ে বড় ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিতেন। ফলে ইঁহার সাম্রাজ্যে বড় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। শাসনকর্ত্তারাও অনেকে বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীন রাজা হইলেন। ফকিরুদ্দিন নামে পূর্ব্ববাঙ্গালার একজন নায়ক

সোনারগাঁও অঞ্চলে স্বাধীন রাজা হন। তারপরেই তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা কাদেরখাঁকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া সুলতান সেকেন্দর নামে বাঙ্গালার রাজা বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করেন। ইহাতে একটা গোলমাল দেশে উপস্থিত হয় এবং আলি মবারক নামে আর একজন নায়ক তাঁহাকে হত্যা করিয়া বাঙ্গালার রাজা হন। হাজি ইলিয়াস্ নামে পূর্ব্ববাঙ্গালার আর একজন নায়ক দেড় বৎসর পরেই আবার ইঁহাকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া প্রধান হইয়া ওঠেন। অল্পদিনের মধ্যেই ইনি সমস্ত বাঙ্গালা অধিকার করিয়া সামসুদ্দিন ইলিয়াস্ সাহ নামে রাজা হইলেন এবং বাঙ্গালার মাৎস্যন্যায় পদ্ধতির রাষ্ট্রবিপ্লবের অবসান করিলেন। গৌড় ছাড়িয়া তিনি পাণ্ডুয়া নামক একটি নগরে নূতন রাজধানী পত্তন করিলেন।

স্বাধীন বাঙ্গালার প্রথম মুসলমান রাজা ইঁহাকেই বলা যাইতে পারে। কেবল স্বাধীন নন, রাজার-মত রাজা হইয়া একটা নিয়মে ইনিই প্রথমে বাঙ্গালা শাসন করেন।

একদিকে যেমন বীর যোদ্ধা, আর একদিকে সামসুদ্দিন তেমনই ধীর ও শান্তস্বভাবের লোক ছিলেন। প্রজাদের সুখশান্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এমনভাবে শাসনের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিলেন, যে অল্পদিনেই প্রজারা তাঁহার বড় অনুগত হইয়া উঠিল।

দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ তোগলকের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার ভাইপো ফিরোজসাহ তোগলক তখন দিল্লীর সম্রাট্। ইনি বড় সদাশয় লোক ছিলেন এবং বিদ্রোহী প্রজারা ও শাসনকর্ত্তারা অনেকেই আবার তাঁহার অনুগত হইয়া উঠিলেন। সামসুদ্দিন দেখিলেন, বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা হইয়া থাকিতে হইলে পাশের রাজাদের বাধ্য করিয়া তাঁহার শক্তি বাড়ান নিতান্ত দরকার।

প্রথমেই তিনি ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ত্রিপুরার রাজা সন্ধির জন্য এক দূত পাঠাইলেন।

সামসুদ্দিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পণে রাজা সন্ধি করিতে চান?"

দূত কহিলেন, "পণের কথা আমাদের রাজা আর কি বলিবেন? সুলতান সাহেব নিজেই বলুন কি পণে তিনি সন্ধি করিতে পারেন। রাজ্য তিনি আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চান না। ইহা ছাড়া আর যাহা চাহিবেন সাধ্য হইলে তাই দিয়া সুলতানকে তিনি সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিবেন।"

সামসুদ্দিন কহিলেন, "তাঁহার রাজ্য আমিও চাই না। চাহিলে সন্ধির পণের কথা তুলিতাম না, যুদ্ধেই জয় করিয়া লইতাম। আমি নূতন রাজা হইয়াছি, রাজত্ব রক্ষা করিতে যথেষ্ট বল বৃদ্ধি করিতে হইবে। সেজন্য বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে।"

দূত কহিলেন, "ত্রিপুরার রাজকোষে বহু অর্থ সঞ্চিত আছে। তাহার অর্দ্ধেক তিনি আপনাকে দিবেন।"

"উত্তম! শুনিয়াছি, ত্রিপুরার হাতীও খুব ভাল।"

"পঞ্চাশটি হাতী তিনি আপনাকে দিবেন। যুদ্ধে এইসব হাতী সুলতানের অনেক কাজে আসিবে।"

সামসুদ্দিন আবার কহিলেন, "দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজসাহের সঙ্গে শীঘ্রই হয়ত আমার যুদ্ধ হইবে। তখন ত্রিপুরারাজ আমার শত্রুতা করিবেন না একথা বলিতে পারেন?"

"পারি। শত্রুতা তিনি করিবেন না।"

"যদি করেন?"

"এই কথার উপরে আর কোনও জামিন ত দেওয়া যায় না, সুলতান সাহেব।"

"না, তা যায় না। ভাল, ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট।"

দূত কহিলেন, "আপনার শক্তি যে ভাবে বাড়িতেছে, তাহাতে মনে হয় দিল্লীর সম্রাট্ একেবারে আপনাকে দমন করিতে পারিবেন না। অসুবিধা বেশী দেখিলে মুখে অন্ততঃ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেই বাঙ্গালা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। যেমন রাজা আছেন, তেমনই বাঙ্গালার রাজা আপনি থাকিবেন। আপনার এই শক্তিই বড় জামিন, তাহারই খাতিরে ত্রিপুরার রাজা অনর্থক আপনার সহিত শত্রুতা করিবেন না। বহুকাল হইতে ছোট এই পার্ব্বত্য রাজ্য তাঁহারা শাসন করিতেছেন। যাচিয়া কাহারও সঙ্গে কোনও শত্রুতা করেন নাই।"

"ঠিক কথা। ভাল, তবে এই পণে আমি সন্ধি করিব। ভরসা করি, আমার মিত্রই তিনি থাকিবেন; শত্রুতা কখনও করিবেন না।"

সন্ধি হইল। বহু অর্থ এবং পঞ্চাশটি হাতী লইয়া সামসুদ্দিন বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন।

(৩)

বাঙ্গালারাজ্যের সীমান্তের বাহিরেই পাঠানসাম্রাজ্যের অধীন একটি প্রদেশ ছিল তখন কাশী। এই সীমান্ত অঞ্চল রক্ষার জন্য সামসুদ্দিন বন্দোবস্ত করিতে থাকেন। কাশীর শাসনকর্ত্তার সঙ্গে কিছু গোলমালও তাহাতে হয়।

সামসুদ্দিন কেবল স্বাধীন হইয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, আবার দিল্লীর পাঠান সাম্রাজ্যের সীমার মধ্যে আসিয়াও গোলমাল করিতেছেন। ইহাতে সম্রাট্ ফিরোজসাহ বড় চটিয়া গেলেন এবং বৃহৎ একদল সেনা লইয়া বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইলেন। পশ্চিম বাঙ্গালার বিস্তৃত প্রান্তরে এই সেনার সঙ্গে যুঝিয়া ওঠা সহজ হইবে না। ঢাকার উত্তরে একডালা নামে এক স্থানে ভাল একটি দুর্গ ছিল। মধ্যে পদ্মা, ধলেশ্বরী প্রভৃতি বড় বড় নদী।

এসব পার হইয়া যাইতে ফিরোজসাহের হাতী ঘোড়ার ত কথাই নাই, লোকের বলও অনেক নষ্ট হইবে। তাই এক পুত্রকে পাণ্ডুয়ায় রাখিয়া সামসুদ্দিন এই একডালায় গিয়া আশ্রয় লইলেন।

পুত্রকে বলিয়া গেলেন, "ফিরোজসাহ আসিয়াই পাণ্ডুয়া অবরোধ করিবেন। অস্ত্রশস্ত্র যথেষ্ট আছে। খাদ্যদ্রব্যও বহু পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া সাবধানে নগর রক্ষা করিবে। দুর্গের বাহিরে আসিয়া কখনও যুদ্ধ করিও না। এই নগর যতদিন রাখিতে পারিবে, ফিরোজসাহ ততদিন পূর্ব্ববাঙ্গালার দিকে সহজে যাইতে পারিবেন না। যদি যান, কতক সেনা রাখিয়াই যাইতে হইবে। তাদের যদি ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পার, পিছন হইতে বাদসাহকে আক্রমণ করিবে। ওদিকে আমি আছি। দুইদিকের আক্রমণে মাঝে পড়িয়া তাঁহাকে হার মানিতে হইবে। আরও কোনও কোনও দুর্গে আমি এই ব্যবস্থা করিয়া সৈন্য রাখিয়া গেলাম। তুমি যদি পাণ্ডুয়া রাখিতে পার, এই সব দুর্গও ইহারা রাখিতে পারিবে। তাঁহাকে পথে বাধাও দিবে। তবে সব যদি এদিকে যায়, তখন শেষ চেষ্টা আমি করিয়া দেখিব।"

ফিরোজসাহ আসিয়া পাণ্ডুয়া অবরোধ করিলেন। রাজপুত্র নবীন যুবা, দীর্ঘকাল দুর্গমধ্যে থাকিয়া কেবল দুর্গ রক্ষা তাঁহার ভাল লাগিল না। সমস্ত সেনা লইয়া বাহির হইয়া বাদসাহকে একদিন তিনি আক্রমণ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে হারিয়া বন্দী হইলেন। পাণ্ডুয়া ফিরোজসাহের দখলে আসিল। তারপর সহজেই অন্য দুর্গগুলি জয় করিয়া, নদীগুলি সব সাবধানে পার হইয়া আসিয়া একডালা দুর্গ অবরোধ করিলেন।

অনেক দিন ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। কিছুদূরে বড় একজন সাধুর আশ্রম ছিল। এই সাধুকে সামসুদ্দিন বড় ভক্তি করিতেন। একদিন সংবাদ পাইলেন, শীঘ্রই সাধু দেহত্যাগ করিবেন। এক ফকিরের বেশ ধরিয়া সামসুদ্দিন বাহির হইলেন। মৃত্যুকালে একবার শেষ দর্শনলাভের জন্য

সাধুর আশ্রমে গেলেন। দেহত্যাগের পর সৎকার হইয়া গেলে সামসুদ্দিনের মনে হইল, সম্রাটের শিবিরে গিয়া তাঁহার বল কত, যুদ্ধের আয়োজন কিরূপ, একবার দেখিয়া গেলেও হয়। তখনই তিনি শিবিরের দিকে চলিলেন। ফকির দেখিয়া কেহ বাধা দিল না; ঘুরিয়া ফিরিয়া সব স্থান তিনি দেখিলেন। সৈন্যদের সঙ্গে আলাপ করিয়াও কথার ছলে অনেক সংবাদ বাহির করিয়া লইলেন। তারপর স্বয়ং সম্রাটের কাছে গিয়াও অনেক আলাপ করিলেন। আলাপে ফকিরের বুদ্ধি ও বিদ্যার পরিচয় পাইয়া ফিরোজসাহ বড় সন্তুষ্ট হইলেন। আরও দেখিলেন, রাজনীতির কথা এবং যুদ্ধের কথাও ফকির বেশ বোঝেন।

ফকির চলিয়া গেলে তাঁহার গুণব্যাখ্যান হইতেছে, এমন সময় একজন প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "অভয় দিলে একটি কথা বলিব জাঁহাপনা!" *

"কি, অভয় দিতেছি, বল।"

প্রহরী কহিল, "এই যে ফকির চলিয়া গেল, সে আর কেহ নয় জাঁহাপনা, বাঙ্গালার রাজা সামসুদ্দিন।"

"সামসুদ্দিন! কিসে জানিলে?"

প্রহরী কহিল, "শিবিরের বাহিরে আমি ছিলাম। ফকিরকে দেখিয়া সঙ্গে কতদুর গেলাম। হঠাৎ ফকিরের পোষাক, মাথার চুল, লম্বা দাড়ী, সব ফেলিয়া দিয়া সোজা হইয়া সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তখন দেখি, রাজা সামসুদ্দিন। হাসিয়া কহিল, বাদসাহকে বলিও সামসুদ্দিন তাঁহার সঙ্গে মুলাকাৎ করিয়া আসিল। আর আমার সেলাম তাঁহাকে দিও।"

* পারস্য ভাষার কথা। জাঁহা—পৃথিবী, পনা—আশ্রয় বা পালক; অর্থাৎ যিনি পৃথিবীর পালক বা আশ্রয়। মুসলমান রাজাদের এই নামে লোকে সম্বোধন করিত।

"বটে! তরোয়াল ছিল না তোমার হাতে? মাথাটা তখনই কাটিয়া ফেলিতে পারিলে না?"

কাঁপিতে কাঁপিতে প্রহরী কহিল, "তরোয়াল ত তারও হাতে ছিল, জাঁহাপনা।"

"ছিল, তাতেই অমনই ভয় পাইলে? কেন, তোমার তরোয়ালে কোন বল ছিল না? ধার ছিল না! যাও! দূর হও!"

প্রহরী ছুটিয়া পলাইয়া গেল। কুর্ণিশ * করিয়া যাইতে হয়, তাহাও মনে পড়িল না।

রাগে ও বিরক্তিতে কতকক্ষণ গুম হইয়া বাদসাহ বসিয়া রহিলেন। শেষে কি ভাবিতে ভাবিতে মুখের ভার কাটিয়া গেল; একটু হাসিয়াই তিনি কহিলেন, "যাই হ'ক, আশ্চর্য্য সাহস আর কৌশল এই সামসুদ্দিনের। এইরূপ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও সুখ আছে। দেখি লড়িয়া। বাধ্য করিতে যদি পারি, আমার মস্তবড় একজন সহায় হইবে বাঙ্গালার এই সামসুদ্দিন ইলিয়াস্ সাহ!"

পারিষদ একজন কহিলেন, "কিন্তু বাধ্য করিতে পারিবেন কি জাঁহাপনা?"

"সম্ভব নয়। না পারি, ক্ষতি কি? এমন একজন লোক যে আছে, তাহাও দেশের একটা গৌরব বটে। হায়, আমার পরে তোগলক বংশের এমন কেহ একজন যদি দিল্লীর তক্তে বসিত, বাদসাহীর জন্য কিছু ভাবিতাম না! কিন্তু কেহ নাই, কেহ হইবে বলিয়াও মনে হয় না। জানিনা, এ বাদসাহীর ভাগ্যে কি আছে!"

---

* মুসলমান রাজাদের সম্মুখে আসিতে হইলে দুই হাতে মাটি ছুঁইয়া সেলাম করিতে করিতে তিনবার পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যাইবার সময়েও পিছনে না ফিরিয়া ঐ ভাবে যাইতে হয়। ইহাকে কুর্ণিশ বলে।

আরও কিছুকাল যুদ্ধ চলিল। তখন বর্ষা আসিয়া পড়িল। ফিরোজসাহ দেখিলেন, ভীষণ জলপ্লাবনে দেশ শীঘ্রই একেবারে ভাসিয়া যাইবে। এত সেনা লইয়া কোথায় কি ভাবে তিনি থাকিবেন, রোগ পীড়া দেখা দিলে কি উপায় করিবেন, বড় উদ্বেগ তাঁহার হইল। বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি সম্রাট্। কিছু রাজকর দিলেই সন্তুষ্ট থাকিব, সামসুদ্দিন ইলিয়াস্ সাহকেই বাঙ্গালার রাজা বলিয়া স্বীকার করিব, তাঁহার রাজকার্য্যে কখনও কোনও হাত দিব না। সামসুদ্দিন যদি ইহাতে সম্মত হন, এখনই আমি ছাউনী তুলিয়া দিল্লী ফিরিয়া যাইব। বন্দীদেরও সব মুক্ত করিয়া দিব।"

ফিরোজসাহ সত্য সত্যইত সম্রাট্। ইহাতে এমন আপত্তি করিবার কোনও কারণ সামসুদ্দিন দেখিলেন না। বিশেষ তাঁহার পুত্র সম্রাটের হাতে বন্দী, সে মুক্তি পাইবে।

সামসুদ্দিন এই প্রস্তাবে সম্মতি জানাইলেন। ফিরোজসাহ দিল্লী ফিরিয়া গেলেন।

কিছুকাল পরে সামসুদ্দিন দিল্লীতে এক দূত পাঠাইলেন। একটা স্থায়ী সন্ধির কথা হইল। ফিরোজসাহ যারপরনাই উদারচেতা লোক ছিলেন। সামসুদ্দিনকেও তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল। এই সন্ধিপত্রে সামসুদ্দিনকে বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা বলিয়া তিনি স্বীকার করিলেন।

দুই বৎসর পরে সামসুদ্দিন কতকগুলি হাতী এবং আরও কিছু মূল্যবান্ উপহার সম্রাট্ ফিরোজসাহকে পাঠান। বিনিময়ে ফিরোজসাহও অনেকগুলি আরবী ও তাতারী ঘোড়া সামসুদ্দিনকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ঘোড়াগুলি বাঙ্গালায় পৌঁছিবার আগেই সামসুদ্দিনের মৃত্যু হইল। তাঁহার রাজত্বের দশ বৎসর মাত্র তখন পূর্ণ হইয়াছিল।

গিয়াসুদ্দিন

(১)

সামসুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সেকেন্দর সাহ রাজা হন। সম্রাট্ ফিরোজসাহ সামসুদ্দিনকে যেমন শ্রদ্ধা করিতেন, তেমনই কিছু ভয়ও করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আবার সম্রাট্ বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। পিতার দৃষ্টান্ত ধরিয়া সেকেন্দর সাহও গিয়া একডালা দুর্গে আশ্রয় লইলেন। ফিরোজসাহও আসিয়া আবার একডালা অবরোধ করিলেন। অনেকদিন যুদ্ধের পরেও দুর্গ অধিকার করিতে না পারিয়া এবারও ফিরোজসাহ সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইলেন। কতকগুলি হাতী এবং প্রচুর অর্থ দিয়া, সেকেন্দর সাহ ফিরোজসাহকে সম্রাট্ বলিয়া মানিবেন এই কথা বলায় শেষে সন্ধি হইল। কিন্তু এ কথা কেবল মুখের কথাই রহিয়া গেল। সেকেন্দর কোন দিন রাজকর পাঠাইলেন না, সম্রাট্ও আদায় করিতে পারিলেন না।

সেকেন্দর সাহের দুই রাণী ছিলেন। বড়রাণীর সতেরটি সন্তান হয়, আর ছোটরাণীর একটিমাত্র পুত্র—নাম গিয়াসুদ্দিন। যেমন দেহের শক্তিতে, তেমনই মনের তেজে, ভাইদের মধ্যে ইনিই খুব বড় হইয়া উঠিলেন। স্বভাবও ইঁহার ছিল যারপরনাই সরল, উদার ও মধুর। সকলেই ইঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। বড়রাণীর বড় ঈর্ষা হইল। ইহাও বুঝিলেন, গিয়াসুদ্দিন থাকিতে তাঁহার কোন পুত্রের রাজা হইবার কোনও আশা নাই।

অনেক ভাবিয়া সেকেন্দর সাহকে একদিন তিনি কহিলেন, "একটি কথা আপনাকে বলিব জাঁহাপনা। তবে ভয় পাইতেছি। শুনিলে আপনি বড় দুঃখ পাইবেন, রাগও খুব হইবে।"

সেকেন্দর কহিলেন, "কি বলিবে বল, ভয় কি? দুঃখই হউক কি রাগই হউক, সত্য কথা সর্ব্বদাই শুনিতে হয়। কেন, রাজপুরীতে কেহ কি আমার শত্রুতা করিতেছে?"

"হাঁ, তাই ত শুনিয়াছি। শুনিয়াছি কি, ঠিক জানিতেও পারিয়াছি।"

"তবে ত অবিলম্বে তোমার সে কথা আমাকে জানান উচিত।"

"হাঁ, তা উচিত বই কি ? নহিলে প্রতিকারের উপায়ও ত কিছু করিতে পারিবেন না।"

"তবে বল, কে আমার সে শত্রু। এখনই জানিতে চাই।"

হাত জোড় করিয়া অতি নরমভাবে রাণী কহিলেন, "আগে বলুন, কাহাকেও একথা বলিবেন না, রাগিয়া হঠাৎ একটা কিছু করিয়া ফেলিবেন না।"

"না, তা করিব না। তুমি বল। বল, কে আমার সে শত্রু!"

"আপনারই পুত্র গিয়াসুদ্দিন।"

"গিয়াসুদ্দিন! গিয়াসুদ্দিন আমার শত্রু ? মিথ্যা কথা!"

রাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে কহিলেন, "মিথ্যা নয় জাঁহাপনা। কোন্ সাহসে এতবড় মিথ্যা কথা আপনার কাছে কহিব ? আমি ঠিক জানিয়াছি, আমার পুত্রদের সে মারিয়া ফেলিতে চায়, আপনাকেও কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়া নিজে এখনই রাজা হইতে চায়।"

গিয়াসুদ্দিন এমন সব ভয়ঙ্কর কাজ করিতে পারেন, কিছুতেই সেকেন্দর সাহ তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। একটুকাল তিনি কি ভাবিলেন। শেষে কহিলেন, "হুঁ! আচ্ছা, তুমি কি করিতে বল আমাকে ?"

ধীরে ধীরে—যেন কত ভয়ে ভয়ে—রাণী কহিলেন, "আমার পুত্রদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু আপনি রাজা। আপনার এতবড় শত্রু যে আপনার সিংহাসন কাড়িয়া লইতে চায়, মৃত্যুই তার উপযুক্ত দণ্ড। তবে সে আপনার পুত্র, এমন কথা বলিতে পারি না যে তার প্রাণদণ্ড করুন।"

"কি তবে বলিতে পার?"

"বন্দী করিয়া তাকে রাখিতে পারেন। আর ইহার পরে কোনও অনিষ্ট না করিতে পারে, তার জন্য—অনেকেই ত করিয়া থাকে—তার চক্ষু দুটি তুলিয়া ফেলিতে পারেন।"

রাগে সেকেন্দরের সমস্ত শরীরে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন, "শয়তানী! এত বড় পাপবুদ্ধি তোর! পুত্রদের মধ্যে গিয়াসুদ্দিন আমার রত্ন; আর তাকে তুই এইভাবে নষ্ট করিয়া ফেলিতে চাস্! সতেরটি সন্তান তোর, তারাও কেহ অযোগ্য নয়। ঈশ্বর এত দয়া তোকে করিয়াছেন, আর ছোটরাণীর একটি মাত্র পুত্র, তাকে তুই হিংসা করিস্? একটু লজ্জা হয় না? ভয় হয় না? যা, দূর হ!"

কি আর করিবেন? ভয়ে ভয়ে রাণী চলিয়া গেলেন। কিন্তু গোপনে গিয়াসুদ্দিনের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। নানারকম অশান্তির সৃষ্টি ইহাতে হইতে লাগিল। আশঙ্কার কারণও অনেক দেখা গেল। গিয়াসুদ্দিনের মাতা একদিন কহিলেন, "গিয়াসুদ্দিন! এ পাপপুরীতে তুমি আর থাকিও না। কি জানি রাক্ষসী কোন্ ছলে শেষে সুলতানকে ভুলাইবে, আমার সর্ব্বনাশ হইবে! কি জানি মনে আরও কি আছে। দূরে কোথাও চলিয়া যাও। খুব সাবধানে থাকিও।"

গিয়াসুদ্দিন কহিলেন, "আমিও সব দেখিতেছি। তাই তবে যাই মা। কিন্তু ইহাও বলিয়া যাইতেছি, বেশীদিন দূরে আমি থাকিব না। কে জানে রাক্ষসী হয়ত সুলতানকেও একদিন বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবে নিজের কোনও পুত্রকে রাজা করিবার জন্য। শীঘ্রই আমি ফিরিয়া আসিব। আর যখন ফিরিয়া আসিব তখন ইহার এমন শক্তিই থাকিবে না যাহাতে আমার কি পিতার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে।

মাতা বলিলেন, "তা যদি পার গিয়াসুদ্দিন, বাঙ্গালার রাজা তুমিই হইবে। মা নাম আমার সার্থক হইবে। যাও, খোদাতালা তোমার মঙ্গল করুন।"

গিয়াসুদ্দিন চলিয়া গেলেন। কতদিন পরে সংবাদ আসিল; বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি বিদ্রোহী হইয়াছেন, রাজধানীর দিকে আসিতেছেন।

সেকেন্দর সাহ বড় বিস্মিত হইলেন। বিদ্রোহী হইয়াছে? গিয়াসুদ্দিন—তাঁহার প্রিয় পুত্র—বহুগুণে তাঁহার বংশের গৌরব—যাঁহাকে বাঙ্গালার সিংহাসন তিনি দিয়া যাইবেন—সেই গিয়াসুদ্দিন বিদ্রোহী হইয়াছে! না, এটা গিয়াসুদ্দিনের একটা ছল। বিদ্রোহের ছলে বিজয়ী হইয়া রাজপুরীতে সে আসিতে চায়, তার পরম শত্রু এই বিমাতা আর তাঁহার পুত্রদের দমনে রাখিবার জন্য। পারে যদি, আপত্তির কথা কিছু নাই, বরং ভালই হইবে। কিন্তু রাজা হইয়া তিনি ত বসিয়া থাকিতে পারেন না, বিদ্রোহীর কাছে হার মানিতেও পারেন না। লোক পাঠাইয়া গিয়াসুদ্দিনকে নিরস্ত হইতে বলিতেও ইচ্ছা হইল না।

বেশ ত, হউক না যুদ্ধ! দেখা যাউক, গিয়াসুদ্দিন কত বড় বীর যোদ্ধা হইয়াছে। জয়ী হইয়া যদি আসিতে পারে, নিজের পুত্র ত, না হয় সিংহাসনই তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। বড় রাণী আর কোনও অনিষ্ট তাহার করিতে পারিবেন না।

যুদ্ধের আয়োজনই রাজা করিলেন,—সেনা লইয়া শেষে অগ্রসরও হইলেন। গিয়াসুদ্দিন ভরসা করিতেছিলেন, বিদ্রোহ করিয়াছেন, সংবাদ পাইলেই পিতা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন, কি লোক পাঠাইয়া এমন একটা বন্দোবস্ত তাহার সঙ্গে করিবেন, যে রাজপুরীতে কোনও ভয়ের কারণ তাহার না থাকে, আর প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিবেন। যখন শুনিলেন, সেকেন্দর সাহও সেনা লইয়া বিদ্রোহ

দমন করিতেই আসিতেছেন, তিনি একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখন নরম হইয়া আত্মসমর্পণ করিবেন, সে ধাতুর লোকই তিনি ছিলেন না। এই পথে যখন পা দিয়াছেন এই পথেই চলিবেন, শেষে খোদাতালা যা করেন। এই মনে করিয়া তিনিও তাঁহার সেনা লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সকলকে গিয়াসুদ্দিন কহিলেন, "সাবধান! সুলতানের গায়ে যেন কোনও আঘাত না লাগে। সর্ব্বদাই মনে রাখিও সকলে, তিনি আমার পিতা। বাধ্য হইয়া যুদ্ধে নামিয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া আমার অস্ত্রে বা আমার সৈনিকের হাতে তাঁহার রক্তপাত হইবে, এতবড় মহাপাতকের ভাগী যেন আমাকে হইতে না হয়। সাবধান!"

কিন্তু যুদ্ধের সময় কখন্ কার হাতের অস্ত্র কার গায়ে গিয়া পড়িবে কি পড়িবে না, এসব একেবারে ঠিক রাখা যায় না। সেকেন্দর সাহ আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। দেখিয়াই গিয়াসুদ্দিন ছুটিয়া গিয়া পিতার পায়ের কাছে লুটিয়া পড়িলেন। সেকেন্দর বড় সাংঘাতিক ভাবেই আহত হইয়াছিলেন। চক্ষু মেলিয়া একবার চাহিলেন, দেখিলেন গিয়াস্। অতি-ক্লেশে গলার স্বর স্পষ্ট করিয়া কহিলেন, "কে, গিয়াস্! আমার খেলা আজ ফুরাইয়া গেল! আজ থেকে বাঙ্গালা তোমার। সুশাসনের গৌরবে রাজত্ব তোমার ধন্য হউক! তোমাকে দেখিলাম, এই আমার তৃপ্তি। আর শেষ বিদায়ে এই আমার আশীর্ব্বাদ! খোদাতালা দোয়া করুন তোমাকে!"

বলিতে বলিতে কণ্ঠ ক্ষীণ হইয়া আসিল। সেকেন্দর সাহ যুদ্ধক্ষেত্রেই বাঙ্গালার মাটিতে দেহ রাখিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন।

(২)

শত্রুপক্ষ সকলকে দমন করিয়া গিয়াসুদ্দিন বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিলেন। সুশাসনে অল্পদিনেই বাঙ্গালী প্রজাসকলের বড় প্রিয়, বড়

শ্রদ্ধার পাত্র তিনি হইয়া উঠিলেন। ন্যায়পরতা রাজার বড় একটি ধর্ম্ম; এই ধর্ম্মের একজন অবতারস্বরূপ তিনি ছিলেন। এ সম্বন্ধে বড় একটি সুন্দর গল্প আছে। গল্পটি এই :—

বীর যোদ্ধা রাজা বা সকলেই বড় মৃগয়াপ্রিয় হইয়া থাকেন। গিয়াসুদ্দিনও তাই ছিলেন। একবার তিনি মৃগয়া করিতে যান। দৈবাৎ তাঁহার বাণে একটি বৃদ্ধা মুসলমান নারীর পুত্র আহত হয়। মুসলমান বিচারকদিগকে লোকে কাজি বলিত। ধর্ম্মশাস্ত্রে যাঁহারা সুপণ্ডিত তাঁহারাই কাজি হইতেন এবং শাস্ত্রের বিধি অনুসারেই বিচার করিতেন।

পুত্রটি যখন আহত হইল, বৃদ্ধা গিয়া রাজধানীর প্রধান কাজি সিরাজুদ্দিনের আদালতে নালিশ করিল। কাজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমার পুত্রকে আহত করিয়াছে?"

বৃদ্ধা কহিল, "সুলতান গিয়াসুদ্দিন।"

"সুলতান গিয়াসুদ্দিন!"

"হাঁ, সুলতান গিয়াসুদ্দিন! তিনি রাজা, কিন্তু তাই বলিয়া গরীব প্রজাকে বিনা অপরাধে মারিতে পারেন না। শিকারের সময় তাঁহাদের হুঁসিয়ার থাকা উচিত, মানুষের গায়ে অস্ত্র গিয়া না লাগে। আপনি মুসলমান, কাজির আসনে বসিয়াছেন। আমি নালিশ করিতেছি, বাঙ্গালার সুলতান গিয়াসুদ্দিন বাণ ছুঁড়িয়া আমার পুত্রকে আহত করিয়াছেন। আপনি বিচার করুন।"

কাজি বড় সঙ্কটে পড়িলেন। মুসলমান শাস্ত্রে সকল মুসলমানই সমান, রাজায় প্রজায় কোনও ভেদ নাই। কাজি তিনি, অপরাধ করিলে রাজারও বিচার করিতে পারেন। তবে রাজ্যের সব বল রাজার হাতে। যদি তিনি আদালতে না আসেন? যদি তাঁহার ন্যায় না মানেন? ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকেই যদি কঠিন কোন শাস্তি দেন? কিন্তু সুলতান যাই করুন,

গিয়াসউদ্দিন ও কাজি

কাজি তিনি, তাঁহার কর্ত্তব্য তাঁহাকে পালন করিতেই হইবে। নহিলে খোদার কাছে কি জবাবদিহি করিবেন? অনেক ভাবিয়া শেষে তিনি আদালতে হাজির হইবার জন্য অপরাধী গিয়াসুদ্দিনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

কাজির হুকুম মানিয়া গিয়াসুদ্দিনও অবিলম্বে আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কাজি কহিলেন, "এই বৃদ্ধার পুত্রকে আপনি বাণ ছুঁড়িয়া আহত করিয়াছেন?"

গিয়াসুদ্দিন কহিলেন,"শিকার করিতে গিয়াছিলাম। শুনিয়াছি, আমার বাণে একটি লোক আহত হইয়াছে। সে কি এই বৃদ্ধার পুত্র?"

"হাঁ, এই বৃদ্ধারই পুত্র সে। আপনি বড় অপরাধ করিয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছেন?"

"হাঁ, পারিতেছি। অপরাধই করিয়াছি।"

কাজি কহিলেন,—"এই অপরাধে সহস্র মুদ্রা আপনার জরিমানা হইল। ক্ষতিপূরণস্বরূপ জরিমানার টাকা এই বৃদ্ধাকে দিন।"

তখনই গিয়াসুদ্দিন একটি মুদ্রার থলি বাহির করিয়া কাজির সম্মুখে রাখিলেন। থলিয়াটি বৃদ্ধার হাতে দিয়া কাজি কহিলেন, "তুমি সন্তুষ্ট হইলে?"

বৃদ্ধা বলিল,—"হাঁ, হইলাম। সেলাম কাজি সাহেব।"

তখন গিয়াসুদ্দিন কহিলেন,—"বড় আনন্দিত হইলাম, কাজি সাহেব, এত বড় একজন ন্যায়পরায়ণ কাজি আমার রাজ্যে আছেন। যদি আজ সুবিচার আপনি না করিতেন, আপনার কোনও খাতির রাখিতাম না। এই ছুরী আপনার বুকে বসাইতাম।"

বলিয়া একখানি ছুরী বাহির করিলেন।

আসন হইতে নামিয়া কাজি তখন সুলতানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "আর যদি আমার এই বিচার আপনি না মানিতেন, আমিও কোনও খাতির করিতাম না। এই কোড়ায় আপনার পিঠ রাঙ্গাইয়া দিতাম!

বলিয়া হাতের বেতখানি তুলিয়া ধরিলেন।

অতি আনন্দে গিয়াসুদ্দিন বাহু দুটি বাড়াইয়া কাজিকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। কহিলেন, "ধন্য হইলাম, কাজী সাহেব! আমার সুলতান নাম আজ সার্থক হইল।"

কাজিও কহিলেন, "আমিও ধন্য হইলাম, সুলতান সাহেব! কাজিগিরি আমার আজ সার্থক হইল। এমনই সব রাজা দেশে দেশে হইলেই এই পৃথিবী স্বর্গ হয়!"

রাজা গণেশ

(১)

স্থলতান গিয়াস্থদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সায়েফউদ্দিন বাঙ্গালার রাজা হন। 'স্থলতান-আস্-সালাতীন' অর্থাৎ রাজার রাজা এই উপাধি তিনি গ্রহণ করেন।

এই সময়ে দিনাজপুর অঞ্চলে ভাতুরিয়া পরগণায় গণেশ নারায়ণ ভাদুড়ী নামে একজন জমিদার বড় প্রবল হইয়া ওঠেন। নামে জমিদার হইলেও তখনকার প্রথায় যেরূপ ছিল, স্থলতানকে মানিয়া তাঁহার অধীনে একজন সামন্ত রাজার মতই এই জমিদারী তিনি শাসন করিতেন, এবং সপ্তদুর্গা বা সাতগড়া নামক একটি স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। চলনবিল নামে খুব বড় একটা বিল বা হ্রদ এই অঞ্চলে আছে। ইহারই তীরে এই রাজধানী ছিল। ইহার চারিদিকে সাতটি গড় বা দুর্গ ছিল। তাই নাম হয় সাতগড়া বা সপ্তদুর্গা।

এই চলনবিলের দক্ষিণে সাঁতোর নামে আর একটি বড় পরগণা ছিল। সেখানকার জমিদার বা রাজার নাম ছিল অবনীনাথ সান্যাল। রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ নামে অতি দুর্দ্দান্ত দুইজন লোক ছিল ইঁহার বড় অনুগত। যুদ্ধের সময় ইহাদের নিকটে বিশেষ সাহায্য পাইতেন, তাই অবনীনাথ ইহাদের কোনও কাজে বাধা দিতেন না।

চলনবিল ও তাহার চারিধারে যে সব গ্রাম ছিল, তাহার কতক অংশ অবনীনাথের আর কতক গণেশনারায়ণের অধিকারে ছিল। রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ এই বিলের কাছাকাছি থাকিত; লুটপাট করিয়া গ্রামবাসীদের উপরে নানা প্রকার অত্যাচার করিত,—অনেক সময়ে গৃহস্থ বধূদিগকেও

কাড়িয়া লইয়া যাইত। ইহাদের প্রতাপে ধন মান প্রাণ কাহারও এই অঞ্চলে নিরাপদ ছিল না। গণেশনারায়ণের অধিকারের মধ্যেও ইহারা যখন তখন আসিয়া এইরূপ অত্যাচার করিত। গণেশনারায়ণ দেখিলেন, প্রজাদের রক্ষা করিতে হইলে, এই দস্যু দুইটাকে দমন করা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ইহারা তাঁহার প্রজা নয়, অবনীনাথের প্রজা। অবনীনাথ ইহাদের দমন করা দূরে থাক্, বরং প্রশ্রয়ই দিতেছেন। অবনীনাথ ইহাদের কোনও বিচার করিবেন না,—করিলে তাঁহাকেই করিতে হইবে। অবিলম্বে পত্র দিয়া কয়েকজন পাইক তিনি অবনীনাথের কাছে পাঠাইলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল,—"দস্যু রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ আমার অধিকারের মধ্যে আমার প্রজাদের উপর বহু অত্যাচার করিতেছে। বহু অভিযোগ আমার প্রজারা তাহাদের বিরুদ্ধে করিয়াছে। তাহারা আপনার প্রজা ও বাধ্য লোক। বিচারের জন্য অবিলম্বে তাহাদের সপ্তদুর্গায় এই লোকদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিবেন। নতুবা আমাকে বলপূর্ব্বক তাহাদের ধরিয়া আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে।"

অবনীনাথ বড চটিয়া গেলেন। উত্তরে লিখিলেন, "রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ আমার প্রজা, চলনবিল ও তাহার চারিধারের সব গ্রামও আমার। এই সব গ্রাম শাসনে রাখিবার ভার আমি তাহাদের হাতে দিয়াছি। যদি কোনও অত্যাচার তাহাতে হইয়া থাকে, প্রজারা আমার কাছে অভিযোগ করিতে পারে, বিচার তার আমি করিব। আপনার কাছে কেন তাহাদের পাঠাইব? বলে কাড়িয়া লওয়ার ভয় দেখাইয়াছেন। ভাল, বল থাকে, সেই চেষ্টা করিবেন। আমিও দুর্ব্বল নই।"

এইরূপ একটা উত্তর যে আসিবে, গণেশনারায়ণ আগেই তাহা বুঝিয়াছিলেন। ইহাও জানিতেন, সাঁতোর আক্রমণ করিয়াই দস্যুদের ধরিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু আগে একটা কারণ না দেখাইয়া হঠাৎ কোন

এতদিন শত্রু ছিলেন, এখন অবনীনাথ তাঁহার বড় একজন আত্মীয় ও সহায় হইলেন।

(২)

সুলতান সায়েফউদ্দিনের পুত্র আজিম সাহ ছিলেন বড় উশৃঙ্খল প্রকৃতির যুবক। একদিন তিনি একটি সুন্দরী হিন্দুকন্যাকে হরণ করিয়া নিতে চেষ্টা করেন। গণেশনারায়ণ কোন একটি কাজে নিকটেই গিয়াছিলেন। এই নারীর চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন। দেখিয়াই তরোয়াল খুলিয়া কহিলেন, "সাবধান সাহজাদা* ! এখনই এই কন্যাকে ছাড়িয়া দেও। নহিলে তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিব।"

"কে তুমি ! আমার ইচ্ছায় আসিয়া বাধা দিতেছ এত বড় সাহস তোমার !"

"আমি ভাতুরিয়ার জমিদার গণেশনারায়ণ ভাদুড়ী। এই নারী আমার মাতা, ইহার মানইজ্জৎ আমাকে রাখিতেই হইবে। সাহজাদা বলিয়া এ অধিকার আপনার নাই যে, দেশের কোনও নারীকে আপনি কাড়িয়া নিবেন। রাজপুত্র আপনি, নারীর সম্মান আপনার রক্ষা করিবার কথা; আর আপনি নারীর উপরে অত্যাচার করিতেছেন, লজ্জা হয় না ? প্রাণের মমতা যদি থাকে, এখনই ছাড়িয়া দিন ইহাকে।—কি ? দিবেন না ? আচ্ছা দেখি !"

বলিয়াই কন্যাটিকে এক হাতে টানিয়া নিজের পিছনে আনিলেন, আর এক হাতে তরোয়াল তুলিয়া ধরিলেন।

আজিমের বড় রাগ হইল। হাঁকিয়া সঙ্গের লোকদের কহিলেন, "আমার উপরে তরোয়াল তুলিয়া ধরে ঐ জমিদার, আর তোমরা তাই দাঁড়াইয়া দেখিতেছ ? যাও, ওকে কাটিয়া ফেল ! মেয়েটাকে কাড়িয়া আন !"

* সাহ—রাজা, জাদা—পুত্র। সাহজাদা—রাজপুত্র।

তরোয়াল খুলিয়া ধাইয়া যাইতেই প্রচণ্ড বিক্রমে গণেশনারায়ণ তাহাদের আক্রমণ করিলেন। তখনই দুইজনকে কাটিয়া ফেলিলেন। আর যাহারা ছিল, ভয়ে পিছাইয়া গেল। গণেশনারায়ণ কহিলেন, "আরও দেখিতে চাও সাহজাদা! যদি এদিকে কেহ এক পা অগ্রসর হয়, তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিব। সাহজাদা বলিয়া কোনও খাতির করিব না।"

আজিমের সঙ্গে লোকজন খুব বেশী ছিল না। গণেশনারায়ণের বিক্রম দেখিয়াও বড় ভয় পাইলেন। ইহাও বুঝিলেন, তাঁহার হাত হইতে কিছুতেই কন্যাটিকে কাড়িয়া লইতে পারিবেন না। অগত্যা তখন চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, "আচ্ছা, দেখিব তুমি কত বড় জমিদার!"

সুলতানের দরবারে আজিম গিয়া নালিশ করিলেন, জমিদার গণেশ নারায়ণ দুই জন সৈনিককে হত্যা করিয়াছে। সুলতান অবিলম্বে দরবারে হাজির হইবার জন্য গণেশনারায়ণের কাছে পরোয়ানা পাঠাইলেন। নির্ভীক গণেশনারায়ণ পরোয়ানা পাইয়াই দরবারে চলিয়া আসিলেন।

দরবারে সুলতান নিজেই বিচার করিতেন। বিচারকের উচ্চ আসনে তিনি বসিয়া আছেন, পাশেই সাহজাদা আজিম। নীচে একদিকে আসামীর কাঠগড়া, আর একদিকে ফরিয়াদীর কাঠগড়া। গণেশনারায়ণ ফরিয়াদীর কাঠগড়ায় গিয়া দাঁড়াইলেন। আজিম কহিলেন, "ওখানে কেন জমিদার? তোমার নামে নালিশ হইয়াছে, আসামীর কাঠগড়ায় যাও।"

গণেশনারায়ণ উত্তর করিলেন, "আসামীর কাঠগড়ায় যাইব? কেন? কে আমার নামে নালিশ করিয়াছে?"

"আমি।"

"আপনি! তাহা হইলে উঁচুতে ঐ বিচারকের আসনের পাশে বসিয়া আছেন কেন? নামিয়া আসুন, ফরিয়াদীর কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়ান!"

রাজা গণেশ

আজিমের বড় রাগ হইল। কিন্তু সুলতান সম্মুখে, কিছু বলিলেন না; নামিয়াও আসিলেন না।

সুলতান কহিলেন, "তোমার নামে এই নালিশ হইয়াছে জমিদার, যে তুমি আমার দুইজন সৈনিককে হত্যা করিয়াছ।"

"হাঁ, করিয়াছি। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য।"

"আত্মরক্ষার জন্য ? কেন তারা কি তোমাকে অকারণে আক্রমণ করিয়াছিল ?

গণেশনারায়ণ উত্তরে কহিলেন, "সাহজাদার হুকুমে তাহারা আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল।"

সুলতান কহিলেন, "সাহজাদা কেন তোমাকে আক্রমণ করিতে হুকুম দিয়াছিলেন ?"

গণেশনারায়ণ কহিলেন, "সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি জাঁহাপানা; সাহজাদার নামেই আমি নালিশ করিতে আসিয়াছি; নামিয়া আসুন সাহজাদা। আসামীর কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়ান। জাঁহাপনার দরবারে আমি আপনার নামে আজ নালিশ করিব!"

সাহজাদার মুখ শুকাইয়া গেল। মাথা নীচু করিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন।

সুলতান বড় বিস্মিত হইলেন। তেজস্বী গণেশনারায়ণের এই সাহসে মনে মনে তাঁহার প্রতি বড় একটা শ্রদ্ধাও তাঁহার হইল। কহিলেন, "কি, কি হইয়াছিল জমিদার ? খুলিয়া সব বল। কোনও ভয় তোমার নাই। অবিচার আমি করিব না।"

গণেশনারায়ণ তখন খুলিয়া সব বলিলেন। সুলতান কহিলেন, "উত্তম করিয়াছ গণেশনারায়ণ! বীরের অসির উপযুক্ত ব্যবহার করিয়াছ। আজিম! এই যদি তোমার স্বভাব হয়, রাজসিংহাসনে বসিলেও সে

সিংহাসন তুমি রক্ষা করিতে পারিবে না। বিস্তর দুঃখ দুর্গতি তোমার নসিবে* আছে। যাও, রাজা গণেশনারায়ণের কাছে নতজানু হইয়া গিয়া ক্ষমা চাও! প্রতিজ্ঞা কর, প্রজার কোনও নারীর উপরে এরূপ দুর্ব্ব্যবহার আর কখনও করিবে না। রাজা যদি তোমাকে ক্ষমা করেন, আমিও ক্ষমা করিব। নহিলে উপযুক্ত শাস্তি তোমাকে পাইতে হইবে।”

নতশিরে ধীরে ধীরে আজিম নামিয়া আসিলেন। জানু পাতিয়া ক্ষমা চাহিবেন, তখন গণেশনারায়ণ তাঁহাকে তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, “এই মহাপ্রাণ সুলতানের পুত্র আপনি, আপনাকে ক্ষমা করিলাম, সাহজাদা। আমার নালিশ আমি তুলিয়া লইলাম। ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া চলিবেন। পরের স্ত্রীকে মায়ের মত দেখিতে হয়, শাস্ত্রের এই উপদেশ মনে রাখিবেন। আপনি রাজা হইবেন। মনে রাখিবেন, প্রজার ঘরে নারী-মাত্রই রাজার কন্যা।”

(৩)

১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান-আস্‌-সালাতীন সায়েফউদ্দিনের মৃত্যু হইল। আজিম তখন দূরে কোথাও ছিলেন। পাণ্ডুয়ার দরবারের প্রধান লোক-বা ওমরাহ যাঁহারা ছিলেন, কেহই আজিমকে পছন্দ করিতেন না। সায়েফউদ্দিনের এক পালিত পুত্রকে ইঁহারা সিংহাসনে বসাইলেন। ইঁহার নাম হইল দ্বিতীয় সামসুদ্দিন। এই সামসুদ্দিন যে বিশেষ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন তা নয়। তবে ওমরাহরা তাঁহার সহায় হইলেন, তাঁহাদের বলই হইল তাঁহার বল। কিন্তু এই বল এত বড় ছিল না যে গণেশ-নারায়ণের মত অত বড় একজন শক্তিশালী জমিদারের উপরে তিনি প্রভুত্ব করিতে পারেন।

* নসিব—অদৃষ্ট, ভাগ্য।

গণেশনারায়ণের দেওয়ান নরসিংহ নাড়িয়াল ছিলেন অতি বিচক্ষণ ও তেজস্বী একজন ব্রাহ্মণ। তিনি তখন কহিলেন, "সুলতান সায়েফ-উদ্দিন নাই। সাহজাদা আজিমকে ত্যাগ করিয়া সামসুদ্দিনকে পাণ্ডুয়ার লোকেরা রাজা করিয়াছে। কিন্তু এই সামসুদ্দিন কে যে তার প্রভুত্ব আপনি স্বীকার করিবেন, মহারাজ ?"

গণেশনারায়ণ উত্তর করিলেন, "না, কেউ নয়, সুলতানের পালিত পুত্র মাত্র। নিজেও অতি অপদার্থ। হাঁ, ঠিক বলিয়াছ নরসিংহ, ইহার প্রভুত্ব আমি স্বীকার করিতে পারি না।"

"খাজনার জন্য পরোয়ানা আসিয়াছে, পাণ্ডুয়ায় পাঠাইয়া দি ?"

"না, পাঠাইও না। বলিয়া পাঠাও, গণেশনারায়ণ ভাতুরিয়ার স্বাধীন রাজা ; পাণ্ডুয়ার সামসুদ্দিনকে কোনও খাজনা তিনি পাঠাইবেন না। অবনীনাথের কাছে লোক পাঠাও। সামসুদ্দিন যদি ভাতুরিয়া আক্রমণ করে, তিনি যেন আমার সহায় হন।"

নরসিংহ কহিলেন, "সহায় তিনি হইবেন। কেন হইবেন না ? ভাতুরিয়ার যুবরাজ যদুমল্ল তাঁহারই জামাতা। কে জানে কালে হয়ত তাঁহার এই জামাতা যদুমল্লই বাঙ্গালার রাজা হইবেন।"

হাসিয়া গণেশনারায়ণ কহিলেন, "অত বড় আশা কি কর নরসিংহ ? ধনবলে, জনবলে, বুদ্ধি বিদ্যার বলে হিন্দুই বাঙ্গালায় বড়। কিন্তু তবু এই দুইশত বৎসর কাল মুসলমান বাঙ্গালার রাজা।"

নরসিংহ উত্তর করিলেন, "দুইশত বৎসর নয় মহারাজ, মাত্র ৫০।৬০ বৎসর। তার আগেও প্রায় অর্দ্ধেক বাঙ্গালার রাজা হিন্দু ছিলেন। এখনও আপনি, অবনীনাথ, আরও অনেক হিন্দু জমিদার বাঙ্গালার বেশী ভাগ শাসন করিতেছেন। নামে সুলতানের অধীন হইলেও শাসন আপনারা স্বাধীন ভাবেই করেন। আজ নামেও আপনি স্বাধীন হইলেন। নায়ক হইয়া

যদি দাঁড়ান, আর ইঁহারা নায়ক বলিয়া আপনাকে মানিয়া নেন, কেন আপনি বাঙ্গালার রাজা হইতে পারিবেন না? কাহাকেও বড় নায়ক বলিয়া আর সকলে মানে নাই, তাই গৌড় পাণ্ডুয়ার শাসনকর্ত্তাদের আর সুলতানদের কাছে মাথা নীচু করিয়া রহিয়াছে। রাজা বলিয়া তাঁহাদের কর দিতেছে।"

"কিন্তু আমাকে কি ইঁহারা নায়ক বলিয়া মানিবেন?"

নরসিংহ উত্তর করিলেন, "স্বাধীন বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করুন। পাণ্ডুয়া অধিকার করুন, সামসুদ্দিনকে দূর করিয়া দিন। আপনার শক্তির পরিচয় পাইলে তখন সকলে মানিবেন। দিল্লীর বাদসাহদের দুর্গতির একশেষ হইয়াছে। সামসুদ্দিন ছাড়া আর কেহ নাই যে আপনার বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। নিজে অপদার্থ হইলেও পাণ্ডুয়ার ওমরাহদের বলে সে বলী। সাহস করিয়া তার বিরুদ্ধে আপনাকে দাঁড়াইতে হইবে। তবে আজই নয়, মা ভবানীর কৃপায় সে সুযোগ শীঘ্রই ঘটিবে। স্বাধীন বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিয়া পাণ্ডুয়ার কর বন্ধ করিয়া দিন, সামসুদ্দিন আপনাকে বাধ্য করিতে আসিবেই। সেই যুদ্ধেই এ সুযোগ আসিবে মহারাজ।"

"সাহজাদা আজিমও অবশ্য পাণ্ডুয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিবেন।"

"সম্ভব। আর তাহাতে আপনার আরও সুবিধা হইবে। আজিমের পক্ষে যোগ দিলে সামসুদ্দিনকে সহজেই দূর করিয়া দিতে পারিবেন।"

"তারপর?"

"পাণ্ডুয়া তাঁকে ছাড়িয়া দিতে পারেন, যদি তিনি আপনার অধীন হন। মুসলমান জমিদার ত বাঙ্গালায় আরও আছেন।"

গণেশনারায়ণ কহিলেন, "কিন্তু সেটা কি খুব সাধু ব্যবহার হইবে নরসিংহ?"

নরসিংহ উত্তর করিলেন, "বক্তিয়ার খিলিজি যখন আসিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন, তাহাই কি তাঁহার সাধু ব্যবহার হইয়াছিল? ফকিরউদ্দিন, আলি মবারক, ইলিয়াস্ সাহ—ইঁহারা কি ভাবে বাদসাহকে তুচ্ছ করিয়া বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন? জানেন ত, 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। রাজ্য চিরদিনই বিজয়ী বীরের অধিকারে আসে। আর বাঙ্গালার সব হিন্দু জমিদার, হিন্দু প্রজা, সকলে যদি রাজা বলিয়া আপনাকে গ্রহণ করেন, আপনিই বাঙ্গালার ন্যায়সঙ্গত রাজা হইবেন। সুশাসনে আর সাধু ব্যবহারে যদি সন্তুষ্ট করিতে পারেন, মুসলমান জমিদার, আর মুসলমান প্রজারাও রাজা বলিয়া আপনাকে মানিয়া নিবেন।"

"আচ্ছা। আজ ভাতুরিয়ার রাজা হইলাম, কাল বাঙ্গালার রাজা হইব, ইহাই আমার সঙ্কল্প রহিল। যাচিয়া আজিমের পক্ষে যাইব না। নিজের উপর নির্ভর করিয়াই সামসুদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধ করিব।"

"কিন্তু আজিম যদি নিজে যাচিয়া আপনার কাছে আসেন? আপনার সহায়তা চান?"

গণেশনারায়ণ কহিলেন, "তখন তাঁকেই আমার পক্ষে নিব, আমি তাঁর পক্ষ নিব না। তিনি ত পাণ্ডুয়া চান। ভাল, পাণ্ডুয়া তাঁহাকে দিব। কিন্তু বাঙ্গালার রাজা হইব আমি গণেশনারায়ণ।"

"মহারাজের জয় হউক!" বলিয়া নরসিংহ তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

হাসিয়া গণেশনারায়ণ কহিলেন, "জয় পরে হইবে। আগে অবনী-নাথের কাছে লোক পাঠাও। তাঁর সহায়তা সকলের আগে চাই।"

নরসিংহ কহিলেন, "কিছুদিন আগে যে আমি বৈবাহিকের বাড়ীতে গিয়াছিলাম।"

"তখনই কি এসব কথা কিছু বলিয়াছিলে তাঁহাকে?"

একটু হাসিয়া নরসিংহ কহিলেন, 'হাঁ। আগে বৈবাহিককে তারপর জামাতাকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইবেন, এই পণ তিনি করিয়াছেন।"

"বটে! আগেই তবে কাজ এতদূর গুছাইয়া রাখিয়াছ নরসিংহ?"

"অনেক আগে হইতেই এই কামনা আমি করিতেছিলাম। সুলতানের মৃত্যুর সুযোগ দেখিয়া কাজও কিছু কিছু গুছাইয়া নিবার চেষ্টা করিতেছি। তবে মহারাজকে আগে জানাই নাই, ক্ষমা করিবেন।"

গণেশনারায়ণ কহিলেন, "ক্ষমা করিবার কিছু নাই নরসিংহ। পুরস্কার কি করিব তাই ভাবিতেছি।"

"মহারাজকে বাঙ্গালার সিংহাসনে দেখিলেই যথেষ্ট পুরস্কার আমার হইবে।"

"আর আমারও ঋণ শোধ হইবে, যে দিন ভাতুরিয়ার দেওয়ান নরসিংহ নাড়িয়াল বাঙ্গালার দেওয়ান হইবেন!"

(৪)

আজিম সাহ লোকজন কিছু সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডুয়ার দিকে আসিতে-ছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন, পাণ্ডুয়া অধিকার করা বড় সহজ হইবে না। তখন শুনিতে পাইলেন, গণেশনারায়ণ স্বাধীন হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার শত্রু সামসুদ্দিন এখন গণেশনারায়ণেরও শত্রু। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে গণেশনারায়ণ তাঁহার সঙ্গে হয়ত যোগ দিতে পারেন। গণেশনারায়ণকে ভাতুরিয়ার স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া নিলে কোনও আপত্তিও তাঁহার হইবে না।

তখনই তিনি এই প্রস্তাব করিয়া গণেশনারায়ণের কাছে বিশ্বস্ত একজন লোক পাঠাইলেন। গণেশনারায়ণও উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন, সাহজাদা

আজিম সাহ পাণ্ডুয়ার দিকে সাবধানে অগ্রসর হউন, তিনি আসিয়া পথে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবেন।

কতকদূর অগ্রসর হইয়া গৌড় নগরের নিকটেই একস্থানে আজিম সাহ ছাউনী ফেলিয়া বসিলেন। পরদিনই গণেশনারায়ণ আসিয়া মিলিবেন, এই বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু সেই দিনই সামসুদ্দিনের সেনা আসিয়া হঠাৎ শিবির আক্রমণ করিল। আজিমের সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তিনি পলাইয়া গেলেন।

আজিমকে ধরিয়া হত্যা করিয়া ফেলিতে না পারিলে তাঁহার সিংহাসন নিরাপদ নহে, তাই সামসুদ্দিন আজিমের পশ্চাতে তাঁহার সেনা লইয়া গেলেন।

এই অবসরে গণেশনারায়ণ আসিয়া গৌড় অধিকার করিয়া তারপর পাণ্ডুয়া আক্রমণ করিলেন।

ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধের পর পাণ্ডুয়া তিনি দখল করিয়া ফেলিলেন। হিন্দু অধিবাসীরা আনন্দে সকলে তাঁহার পক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে গণেশনারায়ণকে বসাইয়া বাঙ্গালার রাজা বলিয়া তাঁহাকে ঘোষণা করিলেন।

ওদিকে একটি খণ্ডযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আজিম সামসুদ্দিনের হাতে পড়িলেন। তখনই তাঁহাকে হত্যা করিয়া সামসুদ্দিন পাণ্ডুয়ার দিকে ধাইয়া আসিলেন।

কিন্তু দেওয়ান নরসিংহের আর পাণ্ডুয়ার হিন্দু প্রজাদের সহায়তায় গণেশনারায়ণ ইহার মধ্যেই যুদ্ধের এমন আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছিলেন, যে সামসুদ্দিন কিছুই আর করিতে পারিলেন না। যুদ্ধে একদিন নিজেই নিহত হইলেন।

বাঙ্গালার মধ্যে গণেশনারায়ণের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ আর রহিল না।

সকলেই তখন তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া নিলেন। এতকাল পরে একজন হিন্দু বাঙ্গালার রাজা হইলেন, মুসলমানরা অবশ্য ইহাতে সুখী হইতে পারেন নাই। প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহ কিছু না করিতে পারিলেও নানা রকমে তাঁহারা অশান্তি ঘটাইবার চেষ্টা করেন। কেহ কেহ আসিয়া ইহাও বলিয়াছিলেন, আপনি মুসলমান হউন, সকলে সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে মানিয়া চলিব।

গণেশনারায়ণ তাঁহার রাণী ত্রিপুরাদেবীকে গিয়া এই কথা বলিলেন। ত্রিপুরাদেবী কহিলেন, "কি, রাজ্যরক্ষার জন্য তোমাকে এখন মুসলমান হইতে হইবে ?"

গণেশনারায়ণ কহিলেন,"হইলে—রাজ্যরক্ষা কিছু সহজ হয়, একথা ঠিক।"

রাণী কহিলেন, "কাজ সহজ করিবার জন্য কি পিতাপিতামহের ধর্ম্ম ছাড়িয়া মুসলমান হইবে ? হিন্দু তুমি লড়াই করিয়া যখন রাজা হইয়াছিলে, তখন কি জানিতে না যে লড়াই করিয়াই রাজ্য তোমাকে রাখিতে হইবে ?"

"তা জানিতাম বই কি ?"

"এখন তবে লড়াইয়ের ভয়ে কেন মুসলমান হইতে চাহিতেছ ?"

হাসিয়া গণেশনারায়ণ কহিলেন, "কে বলিল যে আমি মুসলমান হইতে চাহিতেছি ? ইহারা আসিয়া বলিতেছে, মুসলমান হও, আমরা তোমার বাধ্য হইব। তাই বলিতেছিলাম। আর এ কথাও ঠিক যে মুসলমান হইলে আর লড়াই কিছু বড় করিতে হয় না।"

"বেশ, তবে তাই হও গিয়া। আমাকে আগে কাশী পাঠাইয়া দেও। আর যে দিন শুনিব, তুমি মুসলমান হইয়াছ—"

"কি করিবে সেদিন ?"

"হাতের শাঁখা লোহা ভাঙ্গিব, সিঁথার সিন্দুর মুছিব। সাদা থান পরিয়া বিধবা হইব !"

"আমি বাঁচিয়া থাকিতেই ?"

ত্রিপুরাদেবী উত্তর করিলেন, "আমার স্বামী গণেশনারায়ণ সেদিন আর বাঁচিয়া থাকিবেন না।"

গণেশনারায়ণ তখন কহিলেন, "না, তা থাকিব না। ঠিক বলিয়াছ রাণী! ভয় নাই, আমি মুসলমান হইব না। বাঙ্গালার হিন্দু রাজা হইয়াছি। লড়াই যতই করিতে হউক, শেষ দিন পর্য্যন্ত হিন্দু রাজা থাকিয়াই লড়াই করিব। কিন্তু হয়ত সেই শেষ দিনের সঙ্গে হিন্দুর রাজত্বেরও শেষ হইবে।"

"বালাই! কেন আমার, যদু——"

"যদু! বড় ভয় হয় রাণী, যদু মুসলমান হইবে। পীর সেখ নুর-কুতুব-উল্-ইস্লামের বড় ভক্ত সে। আর মনে হয়, সামসুদ্দিনের কন্যা আসমানতারাকে সে বিবাহ করিবে। পীরের প্রতি ভক্তিতে না হইলেও, এই সাহজাদীর প্রেমে সে মুসলমান হইবে।"

ত্রিপুরাদেবী কহিলেন, "হাঁ, আমিও লক্ষ্য করিয়াছি, সাহজাদীর উপরে বড় একটা টান তার আছে। তা সাহজাদী ত এখন তোমারই আশ্রয়ে। তার বিবাহ কেন দেও না?"

"উপযুক্ত পাত্র পাইতেছি না। আশ্রিত এই রাজকন্যা—যার তার হাতেও দিয়া ফেলিতে পারি না। সাহজাদীর নিজেরও বিবাহে তেমন ইচ্ছা দেখি না। বোধ হয় অপেক্ষা করিতে চায়, আমি মরিলে যদুকে মুসলমান করাইয়া যদি বিবাহ করিতে পারে।"

"তবে উপায় ?"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া গণেশনারায়ণ কহিলেন, "উপায়! উপায় সহজ কিছুই দেখিতেছি না। এক জোর করিয়া সাহজাদীকে কাহারও সঙ্গে বিবাহ দিয়া যদি দূরে পাঠাইয়া দিতে পারি। কিন্তু

সেটা বড় অন্যায় হইবে রাণী। দেখি, যোগ্য পাত্র যদি পাই, হয়ত সাহাজাদীকে সম্মত করাইতে পারিব। নতুবা মা ভবানীর মনে যা আছে, হইবে। তুমি আমি কিছুই করিতে পারিব না। আর বৃদ্ধ হইয়াছি, আমরাই বা কয়দিন ?"

গণেশনারায়ণ যখন মুসলমান হইলেনই না, আর তাঁহার শাসনও বেশ কঠোর হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল, তখন বড় একজন ফকির জৌনপুরে গিয়া সুলতান ইব্রাহিম শার্কীকে বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিলেন। মগধের পশ্চিমে ছিল এই জৌনপুর রাজ্য। ইব্রাহিম শার্কী বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু গণেশনারায়ণের বিক্রমে পরাজিত হইয়া ফিরিতে বাধ্য হইলেন।

অনেক দিন পরে একজন হিন্দু রাজা হওয়ায় হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম্ম বড় একটা বল পাইল। সংস্কৃত বিদ্যা ও সাহিত্যের চর্চ্চা দেশে আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সহায়তায় ধর্ম্মে ও সমাজে প্রয়োজনমত নানারকম সংস্কার করাইয়া গণেশনারায়ণ তাহাকে সজীব ও বলশালী করিয়া তুলিলেন। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে অনেক হিন্দুমন্দির উঠিতে লাগিল; শিক্ষা বিস্তারের জন্য টোল স্থাপিত হইল। এই যে হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দুসমাজের ও হিন্দু সাহিত্যের অভ্যুদয় আরম্ভ হইল, সেই অবধি সে ধারা বরাবর চলিয়াছে, এবং পরে মুসলমান রাজারাও আর ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। ইহার পর আরও প্রায় চারিশত বৎসর বাঙ্গালায় মুসলমান রাজত্ব ছিল। তার মধ্যেও অসংখ্য দেবমন্দির বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামে গ্রামে বড় বড় সব পণ্ডিত সংস্কৃতের আলোচনা করিতেন, টোলে শিষ্যদের বিদ্যাদান করিতেন, দলে দলে লোক তীর্থযাত্রা করিত, পূজা পার্ব্বণের আড়ম্বরে বাঙ্গালার গ্রামগুলি বারমাস সজীব ও আনন্দময় থাকিত। মুসলমান রাজত্বের শেষে এবং

ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভে এই অবস্থাই বাঙ্গালার হিন্দুদের মধ্যে দেখা যায়।

ইহাও গণেশনারায়ণ বেশ বুঝিতেন, মুসলমান নায়করা আর সাধারণ প্রজারা অসন্তুষ্ট থাকিলে, রাজ্যরক্ষা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। মুসলমানদের ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান ও মুসলমানী বিদ্যার আলোচনায় কোনও বাধা ত ইনি দিতেনই না, বরং যেমন হিন্দুদের তেমনই মুসলমানদেরও সাহায্য করিতেন। শাসনে ও বিচারে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনও প্রকার ভেদ রাখিয়া চলিতেন না। মুসলমান প্রজারাও ক্রমে সন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। আপনাদের রাজা বলিয়া ইঁহারা তাঁহাকে এমনই শ্রদ্ধা করিতেন, যে প্রবাদ আছে তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের মধ্যে একটা তর্ক ওঠে, তাঁহাকে কবর দেওয়া হইবে কি দাহ করা হইবে। একজন হিন্দুরাজাকে কবর দিবার দাবী করে, ইহাতেই বুঝা যায় মুসলমান প্রজারা তাঁহাকে কত ভাল বাসিত, এবং কত আপন জন বলিয়া মনে করিত।

মৃত্যুর পর যদুনারায়ণ রাজা হইলেন। একজন বিখ্যাত মল্ল বীর ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে যদুমল্লও বলিত। যে আশঙ্কা গণেশনারায়ণ করিয়াছিলেন, তাহাই সত্য হইল। সেখ নুর-কুতুব-উল-ইস্‌লামের নিকটে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি আস্‌মানতারাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার নাম হইল সুলতান জালালুদ্দিন।

শোনা যায়, গণেশনারায়ণের রাণী তখন পুত্রের কুশপুত্তলিকা দাহ করাইয়া পুত্রবধূ নবকিশোরীকে বিধবার বেশ ধরাইলেন এবং বিধবার ন্যায় ব্রহ্মচারিণী করিয়া রাখিলেন। হাতের ভাঙ্গা শাঁখা, লোহা প্রভৃতি সধবার সব চিহ্ন নবকিশোরী একটি কৌটায় পূরিয়া জালালুদ্দিনের কাছে পাঠাইয়া দেন।

জালালুদ্দিন হিন্দুদের উপরে বড় অত্যাচার করিতেন। গণেশ-নারায়ণের সময় হিন্দুধর্ম্মের যে অভ্যুদয় আরম্ভ হইয়াছিল, যদুর শাসনে তাহাতে বাধা পড়িল। কিন্তু এই সময়ে আবার মহারাজ দনুজমর্দ্দন দেবের আবির্ভাবে এই বাধা দূর হইল।

দনুজমর্দ্দন দেব

মুসলমান হইয়া যদুমল্ল বা জালালুদ্দিন বড় হিন্দুবিদ্বেষী হইয়া ওঠেন, এবং হিন্দুদের উপরে নানারকম অত্যাচার আরম্ভ করেন। রাজা গণেশনারায়ণের প্রভাবে হিন্দুরা তখন এত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া যাইবেন তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ইহার প্রতিকার করিতে হইলে বড় একজন নায়কের অধীনতায় বহু হিন্দুকে দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। কে এই নায়ক হইতে পারেন?

উত্তর বাঙ্গালায় অতি তেজস্বী একজন কায়স্থ জমিদার তখন ছিলেন, দনুজমর্দ্দন দেব। ইনি একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, এবং শক্তি বা দুর্গা ছিলেন ইঁহার ইষ্টদেবী। যদুমল্লের সব অত্যাচারের কথা যখন ইনি শুনিলেন, তখন একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন। একখানি পত্র দিয়া জালালুদ্দিনকে বলিয়া পাঠাইলেন, "হিন্দু ব্রাহ্মণ তুমি, মহারাজা গণেশ-নারায়ণের পুত্র। মুসলমান হইয়া এখন হিন্দুর উপরে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছ। তোমার জননী শুনিয়াছি, কুশপুত্তলিকা দাহ করাইয়া তোমার শ্রাদ্ধ করাইয়াছেন। তোমার স্ত্রী বিধবা ব্রহ্মচারিণী হইয়াছেন।— ইহাতেও তোমার লজ্জা হয় না? মনুষ্যত্ব যদি কিছু থাকে, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার হিন্দু হও। আর সত্যই যদি মুসলমান ধর্ম্মে এত শ্রদ্ধা তোমার

হইয়া থাকে যে তা পার না, হিন্দুর সন্তান হইয়া হিন্দুর উপরে অত্যাচার করিও না। হিন্দু হউক বা মুসলমান হউক—ধর্ম্মের সত্য বুঝিয়া ধর্ম্মকে অন্তরে যে শ্রদ্ধা করে, কাহারও উপরে সে অত্যাচার করিতে পারে না। মুসলমান সাধু অনেক দেখিয়াছি। তাঁহাদের কাছে ধর্ম্মের কথাও অনেক শুনিয়াছি। মুসলমান সাধু পুরুষরা কেহ এ কথা বলেন নাই যে অন্য ধর্ম্মের লোক কাহারও উপরে অত্যাচার করিবে। তাই বলিতেছি, ধর্ম্মে যদি সত্যকার আস্থা তোমার থাকে, অত্যাচার বন্ধ কর। নতুবা পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে বাঙ্গালার রাজা হইয়া তোমাকে আমরা বসিতে দিব না।”

একজন দূত এই পত্র লইয়া আসিয়াছিল। পড়িয়া জালালুদ্দিনের বড় রাগ হইল। তিনি কহিলেন, “ভয় দেখাইয়া কি ধমকাইয়া জালালুদ্দিনকে দিয়া কেহ কোনও কাজ কখনও করাইতে পারে নাই। আমার শত্রুতা যাহারা করে, আমি যে ভাবে পারি তাহাদের দমন করিব। তোমাদের জমিদারকে বলিও, তাঁহার সাধ্য থাকে, এই সিংহাসন হইতে যেন আমাকে নামাইয়া দেন। সুলতান জালালুদ্দিন শক্ত হাতেই তরোয়াল ধরে, আর সেই তরোয়ালে বিদ্রোহীকেও দমন করিতে পারে।”

দূত যখন ফিরিয়া আসিল, ঐ স্থানের প্রধান প্রধান লোকদের ডাকিয়া দনুজমর্দ্দন দেব কহিলেন, “দেহে প্রাণ ধরিয়া স্বধর্ম্ম আর স্বজাতির উপরে জালালুদ্দিনের এই অত্যাচার কখনও সহিব না। হয় জালালুদ্দিনকে দূর করিয়া পাণ্ডুয়ার রাজদণ্ড নিজের হাতে ধরিব, না হয় প্রাণ দিব।—কে আমার সঙ্গে প্রাণপণ করিয়া এই ধর্ম্মযুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত?”

যাঁহারা আসিয়াছিলেন, উত্তরে কহিলেন, “সকলেই আমরা প্রস্তুত মহারাজ!”

“উত্তম! কিন্তু কেবল আমার এই জমিদারীর লোকের দ্বারা হইবে না। সকলে গিয়া মরিতে পারে, কিন্তু কাজ তাহাতে কিছু হইবে না। কেহ

কেহ তোমরা এখানে থাকিয়া লোক সংগ্রহ কর ; কেহ কেহ অন্য অন্য স্থানে চলিয়া যাও। যতদূর পার, বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে সকলকে গিয়া বল, দনুজমর্দ্দন ধর্ম্মরক্ষার জন্য অত্যাচারী সুলতান জালালুদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন। ধর্ম্মের উপরে দরদ যাদের আছে, হিন্দুর ধনমানপ্রাণ যারা রাখিতে চাও, সকলে যার ঘরে যে হাতিয়ার আছে, তাই লইয়া চলিয়া আইস। সকলেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, আমার এই যুদ্ধের ডাকে হয়ত চলিয়া আসিবে।"

সকলে বলিয়া উঠিলেন, "আসিবে মহারাজ! গণেশনারায়ণের পরে কেহই আর জালালুদ্দিনকে সহিতে পারিতেছে না। আপনি যদি হিন্দুর নায়ক হইয়া দাঁড়ান, আপনার পতাকার তলে সকলেই আসিয়া দাঁড়াইবে।"

"বল তবে সকলে—জয় মা ভগবতী চণ্ডিকার জয়!"

"জয় মা ভগবতী চণ্ডিকার জয়!" শত কণ্ঠে এই ধ্বনি আকাশ ভরিয়া উঠিল।

চারিদিকে লোক ছুটিয়া গেল। হিন্দুরা এই রকম নায়কই চাহিতেছিল। হাজার হাজার লোক ভগবতী চণ্ডিকার নামে জয়ধ্বনি করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল।

খুব শীঘ্রই বড় একটি সেনা গড়িয়া উঠিল। সেনা লইয়া দনুজমর্দ্দন দেব পাণ্ডুয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন।

দনুজমর্দ্দন একজন জমিদার মাত্র। এত শীঘ্র এত লোক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে জুটিবে, আর সেই সব লোক লইয়া দনুজমর্দ্দন তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিবেন, জালালুদ্দিন কখনও ইহা মনে করিতে পারেন নাই। সহসা এই আক্রমণে পাণ্ডুয়া ছাড়িয়া প্রাচীন গৌড় নগরে তিনি গিয়া আশ্রয় লইলেন। গৌড় হইল তখন তাঁহার রাজধানী। দনুজমর্দ্দন পাণ্ডুয়ার রাজসিংহাসনে বসিলেন।

নিজের নামে মুদ্রা বাহির করা স্বাধীন রাজার বড় একটা অধিকার। বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা হইয়াও গণেশনারায়ণ কোনও মুদ্রা বাহির করেন নাই। করিয়া থাকিলেও, তাঁহার নামের কোনও মুদ্রা পাওয়া যায় না। রাজা হইয়াই দনুজমর্দ্দন দেব তাঁহার নামে মুদ্রা বাহির করিলেন, এবং সেই মুদ্রা অনেক স্থানে এখনও পাওয়া যাইতেছে। মুদ্রার একদিকে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত অক্ষরে দনুজমর্দ্দন দেবের নাম এবং আর একদিকে 'চণ্ডীচরণপরাণস্য' এই কথাটি লেখা আছে। মুসলমান আমলে দনুজমর্দ্দনের এবং তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রদেবের মুদ্রাব্যতীত বাঙ্গালা ও সংস্কৃত অক্ষরে আর কোন হিন্দু রাজার মুদ্রা এদিকে পাওয়া যায় নাই। এই সময়কার ইতিহাস যাহা কিছু, সব মুসলমানদের লেখা। কিন্তু ইঁহাদের কোনও পুস্তকে দনুজমর্দ্দনের নাম কি তাঁহার এই কীর্ত্তির কথা কিছু নাই। তবে এই সময়ে বড় বড় রাজা জমিদার ও সমাজপতিদের বংশ পরিচয় দিয়া হিন্দু পণ্ডিতেরা 'কুলপঞ্জিকা' নামে সংস্কৃত এক শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিতেন। এইরূপ কোনও কুলপঞ্জিকায় দনুজমর্দ্দন দেবের কথা আছে। আর এই সব মুদ্রা হইতেও জানা যায় যে দনুজমর্দ্দন দেব এই সময়ে পাণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়ায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র দেবের নামেও মুদ্রা পাওয়া যায়।

কতদিন দনুজমর্দ্দন দেব ও তাঁহার পুত্র পাণ্ডুয়ায় রাজত্ব করেন, ঠিক বুঝা যায় না। মুসলমানদের ইতিহাস হইতে জানা যায়, জালালুদ্দিন পাণ্ডুয়া ছাড়িয়া গৌড়ে গিয়া রাজধানী করেন। পাণ্ডুয়ায় আর তিনি ফিরিয়া আসেন না, এবং সেই অবধি বহুদিন আবার গৌড়ই মুসলমানদের রাজধানী ছিল। তখন ১৪০৯ খৃষ্টাব্দ। দেড়শত বৎসরেরও বেশীকাল পরে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুলেমান কিরাণী এই গৌড় ছাড়িয়া টণ্ডায় রাজধানী করেন। এই স্থান গৌড় ও রাজমহলের মাঝামাঝি পথে। পরে

কিছু দিনের জন্য আবার গৌড় রাজধানী হয়। কিন্তু পাণ্ডুয়া কখনও আর রাজধানী হয় না।

একটি প্রবাদ আছে, পাণ্ডুয়া ছাড়িয়া গুরুর আদেশে দনুজমর্দ্দন দেব পূর্ববাঙ্গালায় চন্দ্রদ্বীপে গিয়া রাজা হন। এই চন্দ্রদ্বীপই এখনকার বাখরগঞ্জ অঞ্চল বা বরিশাল জেলা। কেন ঐ স্থানের নাম চন্দ্রদ্বীপ হয়, আর দনুজমর্দ্দন কি ভাবে এখানে আসিয়া রাজা হন, তাহার সম্বন্ধে সুন্দর একটি গল্প আছে।

দনুজমর্দ্দন দেবের গুরুর নাম ছিল চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী। ভগবতী দুর্গার এক নাম কাত্যায়নী এবং এই কাত্যায়নীই ছিলেন ইঁহার ইষ্টদেবী। আবার যে কন্যার সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হয়, তাঁহারও নাম ছিল কাত্যায়নী। ইষ্টদেবীকে সকলে মা বলিয়া থাকেন। মায়ের নামের কোনও কন্যা বিবাহ করা নিষেধ। চন্দ্রশেখরের বড় পরিতাপ হইল। স্ত্রী ত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধরিলেন; তারপর একখানি নৌকায় চড়িয়া বাঙ্গালার দক্ষিণপূবে সাগরের ন্যায় এক মহানদীতে সেই নৌকা লইয়া ভাসিলেন। এক জেলের মেয়েও একখানি মাছধরা ডিঙ্গি চড়িয়া কাছে আসিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কতদূর গেলে পর চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে মা তুমি একা এই ডিঙ্গি লইয়া চলিয়াছ? কোথায় যাইবে?"

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় যাইবে বাবা?"

চন্দ্রশেখর কহিলেন, "আমি এই সাগরে ভাসিয়াছি। ভাসিয়া চলিব, শেষে যেখানে হয় গিয়া মরিব।"

"কেন, মরিবে কেন?"

চন্দ্রশেখর কহিলেন, "মা কাত্যায়নী আমার ইষ্টদেবী। যে কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি, তার নামও কাত্যায়নী। ভুলে এই যে মহাপাপ করিয়াছি, মরিয়া তার প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

মেয়েটি কহিল, "ইহার জন্য মরিতে যাইতেছ? কি পাপ তোমার হইয়াছে? যত নারী এ পৃথিবীতে আছে, সকলের মধ্যেই যে মহামায়া কাত্যায়নী নিজে রূপ ধরিয়া আছেন, সকলেই যে তাঁহার অংশ। সকল পুরুষও তাঁহার রূপ, তাঁহারই অংশ। এই যে বিবাহ সব হয়, পুরুষ রূপে তিনিই তাঁহার নারীরূপকে বিবাহ করেন, করিয়া এই সংসার ধর্ম্ম চালান। ঘরে যাও বাবা। বিবাহ করিয়াছ, স্ত্রীকে লইয়া ঘরসংসার কর। পাপ কিছু নাই, ইহাই তোমার ধর্ম্ম।"

অবাক্ হইয়া চন্দ্রশেখর কতক্ষণ চাহিয়া রহিলেন! শেষে কহিলেন, "কে মা তুমি? এমন সব কথা বলিতেছ—তুমি ত সামান্য জেলের মেয়ে নও!"

"কে বলিল আমি জেলের মেয়ে নই? আমি জেলেরই মেয়ে; আবার বামুনেরও মেয়ে। সব মেয়েই যে আমি! নাম আমার কাত্যায়নী!"

"কাত্যায়নী! তুমিই কি আমার মা কাত্যায়নী?"

খিল খিল করিয়া মেয়েটি হাসিয়া উঠিল। কহিল, "চিনিতে পারিয়াছ? তবে যাও, ঘরে যাও! দেহ ধরিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছ, মিছা নষ্ট করিও না। ঘর সংসার করাই আমার কাজ করা, তাতেই আমার পূজা হয়। গিয়া তাই কর। আর শোন, এই যে সাগর দেখিতেছ, এখানে বড় একটা দ্বীপ হইবে, সেই দ্বীপ হইবে তোমার নামে চন্দ্রদ্বীপ। তোমার শিষ্য এখানে রাজা হইবে। আর এই জলে আমার আর মদনগোপালের বিগ্রহ আছে, তুলিয়া নিয়া পূজা করিও।"

দেখিতে দেখিতে কন্যাটি আকাশে মিলিয়া গেল।

জলে ডুব দিয়া চন্দ্রশেখর বিগ্রহ দুইটি তুলিলেন; লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

নদীর নাম ছিল সুগন্ধা বা সোঁদা। নদীটি মজিয়া বাখরগঞ্জের অনেক স্থান হইয়াছে। সুগন্ধা একটি পীঠস্থান। সতীদেহ লইয়া মহাদেব

পাগল হইয়া যখন ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে সেই দেহ একান্ন ভাগে কাটিয়া ভারতময় ছড়াইয়া দেন। সতীর নাসিকা ইহার তীরে এক স্থানে পড়িয়াছিল, তাই সেই স্থানটির আর এই নদীর নাম হয় সুগন্ধা। বাখরগঞ্জ জেলায় বরিশাল সহরের কত দূর উত্তরে গিয়া শিকারপুর নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামেই সুগন্ধার পীঠস্থান।

দনুজমর্দ্দন চন্দ্রশেখরের বড় প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এই বিগ্রহ দুইটি তিনি দনুজমর্দ্দনকে দান করেন, এবং এই অঞ্চলের রাজা হইতে তাঁহাকে আদেশ করেন।

সমাপ্ত।